

# আদি-লীলা ।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

বন্দে স্বৈরাভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ ।

যবনাঃ স্মনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজয়কাঃ ॥ ১ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।

জয়াদৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

কৈশোর লীলার সূত্র করিল গণন ।

যৌবন লীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

বন্দ ইতি । তং চৈতন্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে । কথমুতম্ ? স্বৈরাভুতেহং স্বৈরা স্বচ্ছন্দা অভুতা লোকোত্তরা দীর্ঘা চেষ্টা যন্ত তম্ । যৎপ্রসাদতঃ যন্ত প্রসাদতঃ যবনাঃ ভাগবতধর্মবিদেষিণঃ শ্লেচ্ছাঃ কৃষ্ণনামপ্রজয়কাঃ কৃষ্ণনামজপ-পরায়ণাঃ সন্তঃ স্মনায়ন্তে অস্মনসঃ স্মনসো ভবন্তীতি স্মনায়ন্তে ভগবদ্ভক্তা ভবন্তীতি । ১ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যৌবন-কালের বিবিধ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্লো । ১ । অর্থ । স্বৈরাভুতেহং ( স্বচ্ছন্দ-লোকোত্তর-চেষ্টিত ) তং ( সেই ) চৈতন্যং ( শ্রীচৈতন্যদেবকে ) বন্দে ( আমি বন্দনা করি ) ; যৎপ্রসাদতঃ ( যাহার প্রসাদে ) যবনাঃ ( যবনগণ ) কৃষ্ণনামপ্রজয়কাঃ ( কৃষ্ণনাম-প্রজয়ক ) [ সন্তঃ ] ( হইয়া ) স্মনায়ন্তে ( স্মনা—গুহুচিন্ত—হইয়াছে ) ।

অনুবাদ । যাহার প্রসাদে যবনগণও কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে গুহুচিন্ত হয়, সেই স্বচ্ছন্দ-অভুত-চেষ্টিত-শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি । ১ ।

স্বৈরাভুতেহং—স্বৈরা ( স্বচ্ছন্দা, স্বেচ্ছাধীনা ) এবং অভুতা ( লোকোত্তরা, অলৌকিকী ) দীর্ঘা ( চেষ্টা ) যাহার ; ইহা “চৈতন্যের” বিশেষণ । শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর লীলা স্বচ্ছন্দা—স্বতন্ত্রা—তাহার নিজের ইচ্ছাধীন, অপর কাহারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে ; তাহার লীলা আবার অলৌকিকী—লৌকিক জগতে কোনও ব্যক্তি তাহার ছায় কার্য্য করিতে পারে না । কাজি-দমন-লীলাদিতে তাহার চেষ্টার এ সমস্ত বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছে ; স্বপ্নযোগে নৃসিংহদেব কর্তৃক কাজির বন্ধোবিদারণ, জাগ্রতেও বিদারণ-চিহ্নের স্থিতি, কীর্তন-বিঘ্নকারী কাজি-ভৃত্যগণের মুখে উদ্ধাপাতন এবং তাহাদের শ্মশ্রু-আদির দাহন, যবনের মুখে হরিনাম-প্রকটন প্রভৃতি প্রভুর স্বচ্ছন্দ এবং অলৌকিক লীলার পরিচায়ক । যবনাঃ—শ্লেচ্ছগণ ; শ্লেচ্ছগণ সাধারণতঃ ভাগবতধর্ম-বিদেষী ছিল ; তাহারা কীর্তন গুণিতে পারিত না ; হৃদঙ্গাদি ভাঙ্গিয়া নামকীর্তনাদিতে বাধা জন্মাইত ; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর রূপায় তাহারাও কৃষ্ণনাম-প্রজয়কাঃ—কৃষ্ণনাম কীর্তনকারী হইল ; তাহাদের চিন্ত পূর্বে নিতান্ত মলিন ছিল, তাই তাহারা কীর্তনাদির বিঘ্ন জন্মাইত ; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর রূপায় কৃষ্ণনাম-কীর্তনের ফলে তাহারা স্মনায়ন্তে—স্মনা—গুহুচিন্ত হইয়া গেল, ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইল ।

২ । করিল গণন—পূর্ববর্তী ১৬শ পরিচ্ছেদে । যৌবন—কৈশোরের পরে—পঞ্চদশ বৎসর বয়সের পরে—যৌবন । অনুক্রম—আরম্ভ ।

তথাহি—

বিজ্ঞানসৌন্দর্য্যসম্বন্ধে-সন্তোষনৃত্যকীর্তনৈঃ।

প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গোবিন্দো দিব্যতি যৌবনে

যৌবন প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ-বিভূষণ ।

দিব্য বস্ত্র দিব্য বেশ মাল্য চন্দন ॥ ৩

বিভোক্তব্যে কাহাকেও না করে গণন ।

সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥ ৪

বায়ুব্যাধি-ছলে হৈল প্রেম-পরকাশ ।

ভক্তগণ লৈঞা কৈল বিবিধ বিলাস ॥ ৫

নৃত্যরীতি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বিভূক্তি কনকশৌর্য্যশরীরাঙ্গনঃ শ্রীগৌরসুন্দরঃ যৌবনে দিব্যতি ক্রীড়তি । কৈরিত্যপেক্ষারামাহ ; বিজ্ঞা শাস্ত্র জ্ঞানং সৌন্দর্য্যং নৃত্যং গায়ত্রীং সন্তোষঃ শোভা-ভূষণাদি সন্তোষঃ খ্যাতি-প্রতিপত্ত্যাদিবিষয়-ভোগঃ নৃত্যং নর্তনং কীর্তনং নামলীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষ্য তু কীর্তনং এতৈঃ ষড়্বিধৈঃ করণৈঃ পুনঃ প্রেমনামপ্রদানৈঃ প্রেমা সহ হরিনাম-বিতরণৈশ্চেতি । ২ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো। ২। অর্থঃ । গৌরঃ ( শ্রীগৌরানন্দ ) যৌবনে ( যৌবনকালে ) বিজ্ঞাসৌন্দর্য্যসম্বন্ধে-সন্তোষনৃত্য-কীর্তনৈঃ ( বিজ্ঞা, সৌন্দর্য্য, সুন্দর বেশ, বিষয়োপভোগ, নৃত্য, কীর্তন দ্বারা ) প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ ( এবং প্রেমনামপ্রদান দ্বারা ) দিব্যতি ( ক্রীড়া করেন বা শোভাপ্রাপ্ত হইল ) ।

অনুবাদ । বিজ্ঞা, সৌন্দর্য্য, সুন্দরবেশ, খ্যাতিপ্রতিপত্তি-আদি-বিষয়োপভোগ, নৃত্য, কীর্তন এবং প্রেম-নাম-প্রদান দ্বারা শ্রীগৌরানন্দ-প্রভু যৌবনে ক্রীড়া করেন ( বা শোভা প্রাপ্ত হইল ) । ২ ।

৩। যৌবন প্রবেশে—শ্রীগৌরানন্দের দেহে যখন যৌবন প্রবেশ করিল, তখন ; যৌবনের প্রারম্ভে ।  
( অঙ্গে অঙ্গ-বিভূষণ—অঙ্গই অঙ্গের বিভূষণ ( অলঙ্কার ) ; যৌবনের প্রারম্ভে প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এমনিই সুন্দর হইল যে, তাহারাই সমস্ত দেহের ভূষণ স্বরূপ হইল ; অর্থাৎ অলঙ্কার ধারণ করিলে দেহের যেকোন শোভা হয়, অলঙ্কার ব্যতীতই—কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সৌন্দর্য্যই—প্রভুর দেহের তদ্রূপ শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল । তাহার উল্লিখিত জিনিষ অঙ্গের দিব্যবস্ত্র—অতি সুন্দর কাপড়, ধুতি ও উত্তরীয় আদি ; দিব্যবেশ—মনোহর বেশভূষা ; এবং মাল্য-চন্দন—ফুলের মালা ও সুগন্ধি চন্দনাদি ধারণ করিতে লাগিলেন ; তাহাতে প্রভুর সৌন্দর্য্য কন্দর্পের ( দর্শনহরণ করিতে ) সমর্থ হইল, ইত্যাদি অর্থ ।

৪। বিভোক্তব্যে—বিজ্ঞাজ্ঞানিত-উক্তব্যে ( প্রগল্ভতায় ) । সমস্ত শাস্ত্রেই প্রভুর অপরিমিত পাণ্ডিত্য ছিল ; তাহাই বিজ্ঞগণের চিত্তি একটু উদ্ধত হইয়াছিল ; তৎকালে নবদ্বীপে যে সকল পণ্ডিত বিজ্ঞমান ছিলেন, তিনি তাহাদের কাহাকেও গ্রাহ্য করিতে নীলা ; বিজ্ঞগণের লোক কিরূপ উদ্ধত হইতে পারে, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই প্রভুর এইরূপ উক্তব্য-লীলার অভিনয় । ৫। সকল পণ্ডিত ইত্যাদি—বস্তুতঃ প্রভু এমন সুন্দর ভাবে অধ্যাপনা করিতেন । যেন—যেদেরা নিকটে এমনি প্রশংসা ও ভক্তি-সম্পর্কিতভাবে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করিতেন যে, অপর কোনও অধ্যাপকই তদ্রূপ করিতে পারিতেন না ; অধ্যাপন-বিদ্যা পারের সকলকেই প্রভুর নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইত । অধ্যাপন—পাঠন্য-প্রদান ; যাদের নিকটে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা ।

৬। বায়ুব্যাধি—বায়ুরোগ ; বায়ুর প্রকোপ-বৃদ্ধি-জনিত রোগ । ছলে—ছদ্মে ; ব্যপদেশে । প্রেমের পরকাশ—প্রেমের প্রকাশিত-রূপের প্রকাশ । বায়ুব্যাধি-ছলে ইত্যাদি—ভক্তের চিত্তে যখন ক্রমঃপ্রেমের উদয় হয়, তখন তাহার আর লোকাপেক্ষা থাকেনা ; প্রেমের প্রভাবে তিনি কখনও বা উচ্চস্বরে হাস্য করেন, কখনও বা ক্রন্দন করতেন, কখনও বা ষষ্ঠীংকার করেন, কখনও বা মূর্ত্ত্যুন্মত্ত হইয়া পড়েন—তিনি লোকাপেক্ষা রহিত হইয়া ষ্টিক যেন পাগলের ছায় আচরণ করেন ( শ্রীভা ১১।২।৪০ ), যৌবনে গৃহস্থপ্রমুখ প্রভুর এক সময়ে এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল ।

দীক্ষা-অনুভবে কৈলাচ প্রেম পুরকায়। কাবান  
দেশে আগমন পুন প্রেমের বিলাস ॥ ৭

কৃত ৬-ম। তবৎ—আহার পরে গয়াতে গমন—পিতার নামে ত্রিবিষ্ণুপাদপদ্ম পিণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রভু গমায় গমন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে ইত্যাদি—গয়াতে ত্রিবিষ্ণুপাদ ঈশ্বরপুরীর সহিত প্রভুর মিলন হয়। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীর শিষ্য। তিনি ইতঃপূর্বে একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন এবং শচীনন্দকে কবিতা প্রদান করিয়াছিলেন; তদনধিই ঈশ্বরপুরীর সহিত প্রভুর পরিচয়। গয়ায় প্রভু একদিন অন্ন ভাজনা প্রদান করিয়া আহারের যোগাড় করিতেছেন; এমন সময়ে ঈশ্বরপুরী আসিয়া তাঁহার অতিথি হইলেন; প্রভু নিজে আহার না করিয়া কেহই ভুক্ষ-দাওন দিয়া পুরী-গোস্বামীকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। ইহার পরে একদিন

শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈতমিলন ।

| অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সম্ভবতঃ সাধন-ভজনে গুরুকৃপার প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার উদ্দেশ্যে লৌকিক রীতিতে প্রভু গয়াতেই ত্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ ( -লীলার অভিনয় ) করেন । **দীক্ষা-অনন্তরে** ইত্যাদি—দীক্ষা-গ্রহণের পরেই পুরী-গোস্বামীর নিকটে প্রভু যখন কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা চাহিলেন, তখন তিনি প্রভুকে আলিঙ্গন দিয়াছিলেন ; আলিঙ্গন যাত্রেই “দৌহার শরীর । সিদ্ধিত হইল প্রেমে কেহ নহে স্থির ॥” আর একদিন প্রভু যখন নিভৃতে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন, তখন প্রেমাবেশে “কৃষ্ণরে, বাপরে, কোথা গেলারে” ইত্যাদি বলিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন । অনেক কষ্টে প্রভুকে সেইদিন সাশ্বনা দেওয়া হইয়াছিল । তাহার পর প্রভু সঙ্গিগণকে বলিলেন, “তোমরা দেশে যাও, আমি প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে মথুরায় যাইব ।” তারপর একদিন শেষরাত্রিতে কাহাকেও না জানাইয়া প্রেমাবেশে মথুরার দিকে যাত্রা করিলেন ; কতদূর যাইয়া দৈববাণী শুনিয়া ফিরিয়া আসিলেন । গয়া-যাত্রা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুর প্রেম-বিকাশের এইরূপ অনেক কাহিনী শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি ১৫শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় ।

**দেশে আগমন** ইত্যাদি—গয়া হইতে দেশে ফিরিয়া আসার পরে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে প্রভু অনেক অদ্ভুত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন । প্রথমতঃ, গয়া হইতে আসার পরেই দু’ চারিজন ভক্তের নিকটে নিভৃতে বিষ্ণুপাদপদ্মের বর্ণনা করিতে করিতে প্রভুর দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি এবং শেষে মুচ্ছা প্রকাশ পাইল । পরে গুরুদ্বন্দ্ব-ব্রহ্মচারীর গৃহে সমস্ত ভক্তগণের সাক্ষাতে নিজের কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ বর্ণন করিতে করিতে প্রভুর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত । ইহার পরে প্রভু সর্বদাই কৃষ্ণবিরহ-বেদনার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন ; হঙ্কার, গর্জন, উচ্চ ক্রন্দন, কম্প, পুলক, মুচ্ছাদি দেখিয়া শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যেমন একদিকে বিশেষরূপে চিন্তিত হইলেন, অপর দিকে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ প্রভুর প্রেমভক্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন । অধ্যাপন-কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল ; পঢ়ুয়ারাও প্রমাদ গণিল । শেষে প্রভু পড়াইতে লাগিলেন ; কিন্তু সে এক অদ্ভুত অধ্যাপনা ; সূত্র, বৃত্তি, পাঞ্জি—বাহা কিছু ব্যাখ্যা করেন, সমস্তের তাৎপর্য্যই কৃষ্ণে নিয়া পর্য্যবসিত করেন । শেষকালে ছাত্রেরাও গুণিতে ডোর দিয়া “হরি হরি” বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং কীর্ত্তন-রসে ভাসমান হইতে লাগিল । প্রভুর এসমস্ত লীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে ।

৮। **শচীকে প্রেমদান**—শ্রীঅদ্বৈতের নিকট শচীমাতার অপরাধ হইয়াছিল বলিয়া প্রভু প্রথমে মাতাকে প্রেম দেন নাই ; পরে কোশলে সেই অপরাধ খণ্ডন করাইয়া তাঁহাকে প্রেম দিয়াছিলেন । ১২। ২। ৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । **অদ্বৈত মিলন**—গয়া হইতে আসার পরে প্রভু একদিন শ্রীল গদাধরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন । যাইয়া দেখেন, শ্রীঅদ্বৈত “বসিয়া করয়ে জল তুলসী সেবন ॥ দুই ভুজ আঙ্গুলিয়া বলে হরি হরি । ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে অর্চন পাঁসরি ॥ মহামন্ত সিংহ যেন করয়ে হঙ্কার । ক্রোধ দেখি যেন মহারুদ্ধ-অবতার ॥” শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিবামাত্রই প্রভু মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন । ভক্ত-অবতার শ্রীঅদ্বৈত ভক্তি-প্রভাবে জানিতে পারিলেন যে “ইনিই তাঁহার প্রাণনাথ ।” তখন তিনি “কতি যাবে চোরা আজি—ভাবে মনে মনে । এতদিন চুরি করি বুল এই খানে । অদ্বৈতের ঠাঞি চোর ! না লাগে চোরাই । চোরের উপরে চুরি করিব এথাই ॥” তখন তিনি যথাবিধি—প্রভুর মুচ্ছাবস্থাতেই—তাঁহার পূজা করিয়া “নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়” ইত্যাদি শ্লোক-উচ্চারণ পূর্বক প্রভুকে নমস্কার করিলেন । তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, “হাসি বোলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়ে । বালকেরে গোসাঞি এমত না জুয়ায়ে ॥” আচার্য্য গদাধরের কথায় হাসিয়া বলিলেন—“ইনি বালক, না আর কিছু—কতদিন পরে জানিতে পারিবে ।”



প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস ।

| খাটে বসি প্রভু কৈলা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ৯

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কতকর্ণ পরে প্রভুর বাহুস্পৃশ্তি হইলে অদ্বৈতের আবিষ্টাবস্থা দেখিয়া তিনি আশ্রয়-গোপনের চেষ্টা করিলেন, স্তুতি-নতি করিয়া আচার্য্যের পদধূলি নিলেন । অদ্বৈত বলিলেন—“তোমার সহিত কীৰ্ত্তন করিতে, কৃষ্ণকথা বলিতে সমস্ত বৈষ্ণবেরই ইচ্ছা ; তুমি এখানেই থাক ।” প্রভু সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১২ ॥ আবার, দৈবরাবেশে প্রভু একদিন রামাই-পণ্ডিতকে বলিলেন—“রামাই, তুমি অদ্বৈতের নিকটে যাইয়া বল, যাহার জন্ত তিনি কত আরাধনা, কত ক্রন্দন, কত উপবাসাদি করিয়াছেন, সেই আমি প্রেমভক্তি বিলাইতে অবতীর্ণ হইয়াছি । শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগমনের কথাও বলিবে । তাঁহাকে বলিবে, আমার পূজার সজ্জ লইয়া তিনি যেন সঙ্গীক আসেন ।” রামাই শান্তিপুরে যাইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন । শুনিয়া আচার্য্য প্রেমোন্মত্ত হইলেন ; বাহুজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন—“শুন রামাই পণ্ডিত । মোর প্রভু হেন আমার প্রতীত ॥ আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহারে দেখায় । শ্রীচরণ তুলি দেই আমার মাথায় ॥ তবে সে জানিযু মোর হয় প্রাণনাথ ।” পূজার সজ্জ লইয়া আচার্য্য সঙ্গীক চলিলেন ; কিন্তু রামাইকে বলিলেন “রামাই ! তুমি প্রভুর নিকটে গিয়া বলিবে যে, আচার্য্য আসিলেন না ; আমি নন্দনাচার্য্যের গৃহে যাইয়া লুকাইয়া থাকিব ; তুমি তাহা প্রকাশ করিও না ।” সর্বজ্ঞ প্রভু আচার্য্যের সঙ্কল্প জানিতে পারিলেন ; জানিয়া শ্রীবাসের গৃহে যাইয়া আবেশে ত্রিমুখটায় বসিলেন এবং হুঙ্কার করিতে করিতে—“নাচা আইসে নাচা আইসে—বোলে বারে বারে । নাচা চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে ।” উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রভুর আবেশ জানিয়া সময়োচিত সেবা করিতে লাগিলেন । এমন সময় রামাই-পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত । তিনি কিছু না বলিতেই প্রভু বলিয়া ফেলিলেন—“মোরে পরীক্ষিতে নাচা পাঠাইল তোরে । \*\*\*জানিয়াও নাচা মোরে চালায় সদায় । এথাই রহিল নন্দন-আচার্য্যের ঘরে । মোরে পরীক্ষিতে নাচা পাঠাইলেন তোরে ॥ আন গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে ।” রামাই নন্দনাচার্য্যের গৃহে গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিলে শ্রীঅদ্বৈত আনন্দিত চিত্তে প্রভুর স্তব পড়িতে পড়িতে এবং দূর হইতেই দণ্ডবৎ করিতে করিতে সঙ্গীক আসিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । প্রভু রূপা করিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন ; আচার্য্য স্তবস্তুতি ও যথাবিধি পূজাদি করিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন এবং “সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাসুন্দর । চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায় ॥”—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৬ষ্ঠ অধ্যায় ।

**বিশ্বরূপ দর্শন**—নন্দন-আচার্য্যের গৃহ হইতে আসিয়াই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিশ্বরূপের দর্শন পাইলেন ( আচার্য্য প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন, অন্তর্যামী প্রভু তাহা দেখাইলেন ) । আচার্য্য দেখিলেন—“জিনিয়া কন্দৰ্প-কোটি লাবণ্যসুন্দর । জ্যোতির্ময় কনক-সুন্দর কলেবর ।” প্রভুর “দুই বাহু কোটি কনকের স্তম্ভ জিনি । তহিঁ দিব্য অলঙ্কার—রত্নের খেঁচনি ॥ শ্রীবৎস-কৌমুভ-মহামণি শোভে বক্ষে । মকর-কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে ॥ পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥ \*\*\*ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে ॥ কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার । জ্যোতির্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর ॥ দেখে পড়ি আছে চারি পঞ্চ শত মুখ । মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি গুণ ॥ মকরবাহন-রথ এক বরাঙ্গনা । দণ্ড পরণামে আছে যেন গঙ্গা সমা ॥ তবে দেখে স্তুতি করে সহস্রবদন । চারিদিকে দেখে জ্যোতির্ময় দেবগণ ॥ উলটিয়া চাহে নিজ চরণের তলে । সহস্র সহস্র দেব পড়ি ‘কৃষ্ণ’ বলে ॥ দেখে সপ্তফণাধর মহানাগগণ । উর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ ॥ অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ । গজহংস অংশে নিরোধিল বায়ুপথ ॥ কোটি কোটি নাগবধু সজল-নয়নে । ‘কৃষ্ণ’ বলি স্তুতি করে দেখে বিম্বমানে ॥ ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে । দেখে পড়ি-আছে মহাঋষিগণ পাশে ॥” এই অপরূপ রূপে প্রভু অদ্বৈতের নিকটে তাঁহার আরাধনার কথা এবং তজ্জন্ত স্থায় অবতরণের কথা প্রকাশ করিলেন । শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৬ ॥ ১৪৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

৯ । **প্রভুর অভিষেক** ইত্যাদি—একদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভু পরম বিহ্বল নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া

তবে নিত্যানন্দস্বরূপের আগমন ।

| প্রভুকে মিলিয়া পাইল যড়ভুজ দর্শন ॥ ৩৯

গোর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

শ্রীবাস-ভবনে আসিয়া ঐশ্বর্যের ভাবে আবিষ্ট হইলেন ; ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভক্ত আসিয়া মিলিত হইলেন এবং কীর্তন আরম্ভ করিলেন ; প্রভু কতক্ষণ নৃত্য করিয়া বিষ্ণু-খটায় উঠিয়া বসিলেন । অচ্যুত দিনেই প্রভু বিষ্ণু-খটায় বসেন—কিন্তু তাহা যেন না জানিয়া—ভাবের আবেশে—বসেন । আজ কিন্তু তাহা নয় ; আজ বসিলে প্রহর সাত প্রভু ব্যক্তি হইয়া ॥ জোড়হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ । রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন ॥ ” সকলেই মনে করিলেন—স্বয়ং বিষ্ণু-নাথ খটায় বসিয়াছেন । তখন প্রভু আদেশ করিলেন—“বোল মোর অভিব্যেক গীত ॥ ” তখন সকলে মিলিয়া অভিব্যেক গীতি গান করিলেন । প্রভু সকলের দিকে রূপাঙ্গী করিলেন ; তখন প্রভুর অভিব্যেক করার নিমিত্ত সকলের ইচ্ছা হইল । তখন “সব ভক্তগণ বহি আনে গঙ্গাজল । আগে ছাকিলেন দিব্যবসনে সকল ॥ ” শেবে শ্রীকপূর-চতুঃসং-আদি দিয়া । সজ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হইয়া ॥ মহা জয় জয় ধ্বনি শুনি চারিভিতে । অভিব্যেক-মন্ত্র সবে লাগিলা পড়িতে ॥ সর্বাপে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি ॥ ” প্রভুর শ্রীনিবের জল দিয়া কুতুহলী ॥ অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যতেক প্রধান । পড়িয়া পুরুষ-স্বভূত করায়েন মন ॥ ” যুকুন্দাদি অভিব্যেক-গীত গাহিতে লাগিলেন ; বসন্তগণ ইন্দুধ্বনি করিতে লাগিলেন । ভক্তগণের মধ্যে কেহ কীদিতে, কেহবা নাচিতে লাগিলেন । এইরূপে মহাসমারোহে প্রভুর রাজ-রাজেশ্বর-অভিব্যেক হইল । পরবর্তী পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত প্রভুর মিলনের পূর্বেই এই অভিব্যেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল ; কিন্তু শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্য খণ্ডের নবম অধ্যায়ের অভিব্যেক-বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলনের পরে রাজ-রাজেশ্বর অভিব্যেক হইয়াছিল । শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলনের পূর্বে শ্রীবাসের গৃহে প্রভু একবার ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া নিজ তত্ত্ব ব্যক্তি করিয়াছিলেন ; ( শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১১ ) ; তখন শ্রীবাস প্রভুর স্তব-স্ততি ও পূজাদি করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই সময়ে অভিব্যেক করার প্রমাণ চৈতন্য-ভাগবতে পাওয়া যায় না ।

খাটে বসি—বিষ্ণুখটায় বসিয়া ।

১০ । শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের—শ্রীগরিত্যানন্দ-প্রভুর । শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বয়স যখন অতি উন্নত, তখনই এক সন্ন্যাসী তাহার পিতা-মাতার অমৃতমতি লইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া যান ; সন্ন্যাসীর সঙ্গে অনেক তীর্থে বিচরণ করিয়া শ্রীনিতাই বন্দাবনে আসিলেন ; সেখানে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনবদীপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন ; তখনই তিনি শ্রীনবদীপ যাত্রা করিলেন এবং আসিয়া নন্দন-আচার্যের গৃহে অতিথি হইলেন । ইহার কীরকদিন আগেই ইহা প্রভু ভক্তবৃন্দকে জানাইয়াছিলেন যে, শীঘ্রই নবদীপে কোল ও মহাপুরুষের আগমন হইবে ; যেদিন শ্রীনিত্যানন্দ চান নন্দন-আচার্যের গৃহে আসিলেন, সেইদিন প্রাতঃকালে প্রভু ভক্তবৃন্দকে বলিলেন “আমি গত সন্ধ্যাতে স্বপ্নদেখিয়াছি এক অমূল্যমূর্তি নবদীপে আসিয়া গৃহের সম্মুখে আসিয়া—ইহা শ্রীমদ্রূপ-পণ্ডিতের নবদীপ কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহার প্রকাণ্ড শরীর, স্বকৈ এক মহাস্তম্ভ ; বামহাতে বৈত্রবাক্য এক কাপা কুন্ত, হস্তকে হস্ত পাশ্বধানে মীলধ্বজ, বাম কপে এক কুণ্ডল ; দেখিলে যেন ঠিক বলরাম বলিয়া মনে হয় ; আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—“এই তাই হইবে । তোমার আমার কালি হৈব পরিচয়ে । ” এসকল কথা বলিতে বলিতে প্রভুর দাছ লোপ পাইল, বলরামের তাকে তিনি আবিষ্ট হইলেন । পরে প্রভু বলিলেন—“আমি পূর্বেও বলিয়াছি ; আজও আমি হইতেছি—কোন মহাপুরুষ যেন আসিয়াছেন ; তোমারা যোজ করিয়া দেখ । ” দুইজন তখনই ছুটিয়া গিয়া প্রত্যেক নীড়িতে গৌর করিলেন ; তিন প্রহর পর্যন্ত যোজ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন । তখন প্রভু একটু হাসিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, চল আমার সঙ্গে । ” সকলে চলিলেন, প্রভু নন্দন-আচার্যের গৃহে বাইয়া উপনীত হইলেন ; দেখিলেন—কোণার্ত-স্বাস্থ্যসমকাস্তি এক মহাপুরুষ যেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন । সপাষদপ্রভু তাহাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন । কাহারও মুখে কথা নাই ; প্রভু চাহিয়া আছেন আগন্তকের সম্বন্ধে ; আগন্তুকাহিয়া আছেন

প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর ।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শাঙ্গ-বেণুধর ॥ ১১

তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র ।

দুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রভুর দিকে । প্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণদ্ব্যন্থের এক শ্লোক পাঠ করিতেই শ্রীনিত্যানন্দ মুচ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন ; শ্রীবাস আরও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন ; কতক্ষণ পরে শ্রীনিতাইয়ের চেতনা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু প্রেমোন্মত্ত হইয়া হুঙ্কার, গর্জ্জন, ক্রন্দন, নৃত্য, লম্বাদি দ্বারা সকলকে বিম্বিত করিতে লাগিলেন । কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না ; তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে কোলে লইলেন, অমনিই শ্রীনিতাই নিষ্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিলেন । তারপর ঠারে ঠোরে উভয়ের আলাপ হইল ; শ্রীনিতাই তীর্থ-ভ্রমণের কথা, বৃন্দাবন-গমনের কথা, বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আসার কারণ সমস্ত বলিলেন । শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য । ৩-৪ ।

**প্রভুরে মিলিয়া** ইত্যাদি—মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীনিতাই মহাপ্রভুর ষড়্ভুজরূপের দর্শন পাইলেন । শ্রীচৈতন্যভাগবতের মতে, মিলনের দিনেই ষড়্ভুজরূপ প্রকটিত হয় নাই ; ব্যাসপূজার দিনে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যখন মহাপ্রভুর মস্তকে মালা দিলেন, তখনই প্রভু ষড়্ভুজরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য । ৫ ।

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত লীলা-ক্রমের সহিত অনেক স্থলেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণিত লীলা-ক্রমের মিল দেখা যায় না । গ্রন্থকারের লীলারসাবেশবশতঃই বোধ হয় এইরূপ হইয়া থাকিবে ।

**১১। ষড়্ভুজ**—ছয়টি বাহু বিশিষ্ট রূপ । **শাঙ্গ**—মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের ধনুকের নাম শাঙ্গ (মাখন লাল ভাগবতভূষণ) । শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমনিত্যানন্দ-প্রভুকে যে ষড়্ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র, এক হাতে গদা, এক হাতে পদ্ম, এক হাতে শাঙ্গধনু এবং এক হাতে বেণু ছিল । শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চারিটি দ্বারকানাথের অস্ত্র, শাঙ্গ মথুরানাথের অস্ত্র এবং বেণু ব্রজনাথের বৈশিষ্ট্য । ছয় হস্তে এই ছয়টি বস্তু ধারণ করিয়া প্রভু সম্ভবতঃ দেখাইলেন যে, তিনি দ্বারকানাথ, মথুরানাথ ও ব্রজনাথের মিলিত বিগ্রহ—অর্থাৎ দ্বারকা, মথুরা ও ব্রজে একই শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত বিশিষ্ট ভাব-বৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছে, এক শ্রীমন্ মহাপ্রভুতেই উক্ত তিন ধামের সে সমস্ত ভাব-বৈচিত্রী বর্ত্তমান আছে । অথবা, তিনি ইহাই দেখাইলেন যে, দ্বাপর-লীলায় যিনি দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তিনিই এই কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । দ্বারকানাথ, মথুরানাথ ও ব্রজনাথ এই তিন স্বরূপের বর্ণই ছিল গ্রামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ । এই তিনের মিলিত বিগ্রহ ষড়্ভুজরূপ ও গ্রামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়াই মনে হয় ।

যাহা হউক, এস্থলে ষড়্ভুজরূপের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনার মিল নাই । শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন, প্রভুর ছয় হাতে “শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুঘল” ছিল ; হল ও মুঘলের পরিবর্ত্তে কবিরাজ-গোস্বামী শাঙ্গ ও বেণু লিখিয়াছেন । হল ও মুঘল শ্রীবলরামের অস্ত্র । মুরারিগুপ্তের কড়চায় ষড়্ভুজরূপের উল্লেখ আছে ( ২৮৮২৭ ), কিন্তু বর্ণনা নাই । কড়চায় চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজরূপেরও উল্লেখ আছে ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে ষড়্ভুজ ব্যতীত অল্প রূপের উল্লেখ নাই ।

**১২। তিন অঙ্গ বক্র**—গ্রীবা, কটি ও জাম্বু এই তিন অঙ্গ বক্র ( বন্ধিম ) । শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রথমে পূর্ব-পয়ার-বর্ণিত ষড়্ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন ; পরে ষড়্ভুজরূপ অন্তর্হিত করিয়া চতুর্ভুজরূপ দেখাইলেন ; এই চতুর্ভুজরূপের এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র ছিল, আর দুই হাতে তিনি বেণু বাজাইতেছিলেন । শঙ্খ-চক্র দ্বারা ঐশ্বর্য্য এবং ত্রিভঙ্গরূপে বেণু-বাদন-ভঙ্গী দ্বারা ঐশ্বর্য্যগর্ভ পূর্ণতম মাধুর্য্য সূচিত হইতেছে । এই চতুর্ভুজরূপ-প্রদর্শনের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে ব্রজনাথের ঐশ্বর্য্যগর্ভ-পূর্ণতম মাধুর্য্য থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে তিনি দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্যও প্রকটিত করিবেন । পূর্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন ।

শ্যাম-অঙ্গ পীত-বস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩

তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাসপূজন ।

নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুঘলধারণ ॥ ১৪

তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ দুইভাই ।

তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই ॥ ১৫

তবে সপ্তপ্রহর প্রভু ছিল ভাবাবেশে ।

যথার্থ ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৬

বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি ভবনে ।

তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৩। চতুভুজরূপ অন্তর্হিত করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু আবার শ্রীমন্নিত্যানন্দকে দ্বিভুজ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ দেখাইলেন ; এই দ্বিভুজরূপের বর্ণ শ্যাম, পরিধানে পীতবস্ত্র এবং বদনে বংশী । সর্বশেষে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ প্রদর্শনের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন-সম্বন্ধীয় ভাবই শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে মুখ্যতঃ প্রকটিত হইবে । পূর্ববর্তী ১২ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য ।

১৪। ব্যাস পূজন—আষাঢ়ী-পূর্ণিমাতে সন্ন্যাসিগণ ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন ; শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে ব্যাসপূজা করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্যভাগবত । মধ্য । ৫।

নিত্যানন্দাবেশে—নিত্যানন্দের আবেশে । ব্রজের শ্রীবলরামই নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । এস্থলে নিত্যানন্দাবেশ বলিতে নিত্যানন্দের অভিন্নরূপ বলরামের আবেশই বুঝাইতেছে । বলরামের অস্ত্র ছিল মুঘল ; বলরামের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু হস্তে মুঘল ধারণ করিয়াছিলেন । শ্রীপাদ নিত্যানন্দের তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়েই মহাপ্রভু “বলরাম ভাবে উঠে খট্টার উপর । শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৫।” ব্যাসপূজার পূর্বের দিন শ্রীবাসের গৃহে এই লীলা হইয়াছিল ।

১৫। তবে শচী দেখিল ইত্যাদি—এক দিন রাত্রিতে শচীমাতা স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহাদের শ্রীমন্দিরের কৃষ্ণ ও বলরাম এবং নিমাই ও নিত্যানন্দ চারিজন নৈবেদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছেন । পর দিন প্রাতঃকালে শচীমাতা প্রভুকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন । প্রভু সেই দিন নিত্যানন্দকে আহারের অল্প নিমন্ত্রণ করিতে বলিলেন । মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু যখন আহারে বসিলেন, তখন শচীমাতা দেখিলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামই ভোজন করিতেছেন । শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য । ৮। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম, এই লীলার তাহাই প্রভু দেখাইলেন ।

তবে নিস্তারিল ইত্যাদি—জগাই-মাধাই-উদ্ধার লীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে ।

১৬। এক দিন শ্রীবাসের গৃহে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবিচ্ছিন্ন ভাবে সাত প্রহর পর্য্যন্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া ছিলেন এবং ভক্তগণের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন । শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য । ১১।

১৭। বরাহ-আবেশ—বরাহ-অবতারের ভাবে আবিষ্ট । মুরারি-ভবনে—মুরারিগুপ্তের গৃহে ।

এক দিন প্রভু মুরারিগুপ্তের গৃহে গেলেন ; গুপ্ত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে প্রভু “শুকর শূকর” বলিয়া গুপ্তের বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে জলের গাড়ু দেখিয়া “বরাহ-আকার-প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে । স্বাস্থ্যভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে ॥ গর্জে যজ্ঞবরাহ—প্রকাশে খুর চারি।” প্রভুর আদেশে মুরারিগুপ্ত তখন প্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন । স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রভু নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদের অসারতা এবং স্বীয়-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন । শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য । ১০।

তার স্কন্ধে চড়ি ইত্যাদি—একদিন মুরারিগুপ্তের গৃহে নারায়ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু “গরুড় গরুড়” বলিয়া ডাকিতেছিলেন ; তখন মুরারিগুপ্ত গরুড়ের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভুকে কাঁধে করিয়া নাচিয়াছিলেন । শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য । ১০।



তবে শুক্লাশ্বরের কৈল তগুল-ভক্ষণ।  
 ‘হরেন্নাম’ শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥ ১৮  
 তথাহি বৃহন্নারদীয়ে ( ৩৮।১২৬ )—  
 হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্।  
 কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরগুণা ॥ ৩

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।  
 নাম হৈতে হয় সর্ব জগত-নিস্তার ॥ ১৯  
 দার্ঢ্য লাগি হরেন্নাম উক্তি তিনবার।  
 জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা।

১৮। তবে শুক্লাশ্বরের ইত্যাদি—শুক্লাশ্বর-ব্রহ্মচারী নবদ্বীপে থাকিতেন; প্রভুর একান্ত ভক্ত; নিতান্ত দরিদ্র, ভিক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইতেন। একদিন প্রভুর কীৰ্ত্তনে ভিক্ষার বুলি স্বপ্নে করিয়া শুক্লাশ্বর নৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভক্তবৎসল শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার বুলি হইতে ভিক্ষার চাউল লইয়া খাইয়াছিলেন। তগুল-চাউল। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ১৬।

হরেন্নাম-শ্লোকের ইত্যাদি—হরেন্নাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিলেন। পরবর্তী পয়ার সমূহে এই অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অথবা আদি-লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে তৃতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পরবর্তী ১৯-২২ পয়ারেও এই শ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯। কলিযুগে ইত্যাদি—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ নামরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। নাম ও নামী যে অভেদ, ইহা দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। কলিতে নামরূপেই শ্রীকৃষ্ণ জীবগণকে কৃপা করেন; শ্রীনামের ( শ্রীকৃষ্ণনামের ) কৃপা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল বলিয়া মনে করা যায়। “সর্বসদগুণপূর্ণাঃ তাং বন্দে ফাক্তন পূর্ণিমাম্। যন্তাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তোবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥ ১।১৩।২ ॥”—এই শ্লোক হইতে জানা যায়; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণনামও এক অপূর্ণ শক্তি এবং এক অপূর্ণ মাধুর্য লইয়া সেই সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন লীলা অন্তর্ধান করিলেন, নাম কিন্তু অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন না, কলির জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ নাম জগতে রহিয়া গেলেন। নাম হৈতে ইত্যাদি—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ( যথাবিধি নাম-কীৰ্ত্তন করিলেই ) জগদ্বাসী জীব সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার ( নিস্তার ) লাভ করিতে পারে; এজন্ত যজ্ঞ-ধ্যানাদি অপর কোনও সাধনের প্রয়োজন হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—“সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্যা দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, কলিতে একমাত্র নামসকীৰ্ত্তন দ্বারাই তাহা পাওয়া যায়। ক্রতে যদ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্বিকীৰ্ত্তনং ॥ শ্রীভা। ১২।৩।৫২।” জগত-নিস্তার—জগতের বা জগদ্বাসীর উদ্ধার; সংসারমোচন।

২০। দার্ঢ্যলাগি—দৃঢ়তার জন্ত; দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে। হরেন্নাম ইত্যাদি—কলিতে যে হরিনামই একমাত্র গতি, কলিতে যে অন্য গতি নাই—একথা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই হরেন্নাম-শ্লোকে “হরেন্নাম”-শব্দ তিনবার বলা হইয়াছে। জড়লোক—অজ্ঞান লোক। পুনরেবকার—পুনঃ+এবকার; পুনরায় “এব” (ই)-শব্দের প্রয়োগ ( উক্ত শ্লোকে )। উক্তশ্লোকে তিনবার হরেন্নাম-শব্দ বলার পরেও আবার “এব” শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। শ্লোকের তৃতীয় শব্দ “হরেন্নামৈব।” হরেন্নাম-শব্দের সহিত “এব” শব্দের যোগ হইলেই সন্ধিতে “হরেন্নামৈব” হয়; দৃঢ়তার জন্ত তিনবার “হরেন্নাম” বলার পরেও পুনরায় “এব” শব্দ কেন বলা হইল, তাহার কারণ বলিতেছেন—“যাহারা অজ্ঞান, যুর্থ, শাস্ত্রমৰ্ম্ম জানে না,—হরিনামই যে কলিতে একমাত্র সাধন—তাহাদিগকে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্তই এব-শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এব শব্দের অর্থ—“ই”; ইহা নিশ্চয়াত্মক অব্যয়-শব্দ। নিশ্চয়াত্মক-শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাহারা ইচ্ছা করিলে বিচার-তর্কাদি দ্বারা এই শ্লোকের মৰ্ম্ম নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু যাহারা শাস্ত্র জানেন না,

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বিচার-তর্ক জ্ঞানেন না, তাঁহারা ইহাই নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখুন যে, হরিনাম ব্যতীত কলিতে আর অল্প কোনও গতি নাই । অথবা, কলিতে কৰ্ম, যোগ ও জ্ঞান—এই তিনের কোনও প্রয়োজন নাই, একমাত্র হরিনামই শ্রেষ্ঠ উপায়—ইহা বুঝাইবার জন্তই তিনবার হরেনাম বলা হইয়াছে । হরেনাম এবং গতিঃ, ন কৰ্ম ; হরেনাম এবং গতিঃ, ন যোগঃ ; হরেনাম এবং গতিঃ, ন জ্ঞানম্—হরিনামই একমাত্র গতি, কৰ্ম নয় ; হরি নামই একমাত্র গতি, যোগ নয় ; হরি নামই একমাত্র গতি, জ্ঞান নয় ; ইহাই তাৎপর্য । “নামসঙ্কীৰ্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥ ৩ । ২০ । ৭ ॥” কৰ্ম, যোগ এবং জ্ঞানের ( জ্ঞানমার্গের সাধনের ) অল্পস্থানে যে যে ফল পাওয়া যায়, কেবলমাত্র নামসঙ্কীৰ্ত্তনেও সেই সেই ফল পাওয়া যাইতে পারে । “এতন্নিষ্কিণ্ণমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ । যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেনামানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ শ্রীভা, ২ । ১ । ১১ ॥” এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা—ইচ্ছতাং কামিনাং তত্ত্বফলসাধনম্ এতদেব । নির্কিণ্ণমানানাং মুমুক্শুণাং মোক্ষসাধনমেতদেব । যোগিনাং জ্ঞানিনাং ফলঞ্চ এতদেব । নির্ণীতং নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ এই টীকানুযায়ী তাৎপর্য এই । যাহারা কল কামনা করেন ( অর্থাৎ যাহারা কৰ্মী ), তাঁহাদের সাধনও এই নামসঙ্কীৰ্ত্তন ; যাহারা মুক্তিকামী ( জ্ঞানমার্গের সাধনের ফল মুক্তি ), তাঁহাদের সাধনও এই নামসঙ্কীৰ্ত্তন ; যাহারা যোগী, তাঁহাদের সাধনও এই নামসঙ্কীৰ্ত্তন । “নারায়ণাচ্যুতানন্তবাসুদেবেতি যো নরঃ । সততং কীর্ত্তয়েদ্ভূমি ষাতি মল্লয়তাং স হি ॥—বরাহপুরাণ । ভগবান্ বলিতেছেন—যে লোক সৰ্বদা নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব এই সমস্ত নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি আমাতে লয় ( সাযুজ্য ) প্রাপ্ত হইবেন ।” এসমস্ত শাস্ত্র বচনের তাৎপর্য এই যে, যাহারা ইহকালের বা পরকালের সুখভোগ কামনা করেন, তাঁহারা কৰ্ম্মমার্গের অল্পষ্ঠান করিয়া থাকেন ; যাহারা পরমাত্মার সহিত যোগ কামনা করেন, তাঁহারা যোগমার্গের এবং যাহারা ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য কামনা করেন, তাঁহারা জ্ঞানমার্গের উপাসনা করিয়া থাকেন । কিন্তু কৰ্ম, যোগ বা জ্ঞানমার্গের অল্পষ্ঠান না করিয়াও তাঁহারা যদি কেবল হরিনাম মাত্র কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তু তাঁহারা লাভ করিতে পারেন । অবশ্য কৰ্ম, যোগ বা জ্ঞানের ফলই নামসঙ্কীৰ্ত্তনের মুখ্য ফল নহে । নামসঙ্কীৰ্ত্তনের মুখ্য ফল হইল কৃষ্ণপ্রেম ; নামের শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী শক্তি আছে । মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“ঋণমেতং প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি । যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্ ॥—কৃষ্ণা ( দ্রৌপদী ) যে দূরস্থিত আমাকে গোবিন্দ গোবিন্দ বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিয়াছিলেন, তাহাকেই আমি আমার প্রবৃদ্ধ ঋণরূপে আমি গ্রহণ করিয়াছি, আমার হৃদয় হইতে তাহা কখনও অপসারিত হয় না ।” আদিপুরাণেও ভগবান্ বলিয়াছেন—“গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মম সন্নিধৌ । ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোহহং তেন চার্জুন ॥—হে অর্জুন, আমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যে আমার নিকটে নৃত্য করে, আমি তাহার নিকট বিক্রীত হইয়া যাই—ইহা আমি শপথপূর্বক তোমার নিকট বলিতেছি ।” নামশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থবিচার করিলেও উক্তরূপ সিদ্ধান্তই পাওয়া যায় । নম্ ধাতুর উত্তর ঘঞ, প্রত্যয় করিয়া নাম-শব্দ নিষ্পন্ন হয় । নম্-ধাতুর অর্থ নামান । তাহা হইলে নাম-শব্দের অর্থ হইল—যাহা নামাইয়া আনে । কাকে নামায় ? নামগ্রহণকারীকেও নামায় এবং নামী ভগবান্কেও নামায় । নামগ্রহণকারীকে নামায়—দেহাদিতে আবেশজাত অভিমানরূপ উচ্চ পর্বত হইতে, ভক্তির আবির্ভাবের অল্পকূল দৈত্বরূপ নিম্নভূমিতে । আর ভগবান্কে নামায়—তাঁহার স্বীয় ধাম হইতে নামগ্রহণকারীর নিকটে ; অর্থাৎ নাম ভগবান্কে নামগ্রহণকারীর এমনই বশীভূত করিয়া দেন যে, ভগবান্ স্বীয় ধাম হইতে অবতরণ করিয়াও নামগ্রহণকারীকে কৃতার্থ করেন ।

নামের মহিমা ঋগ্বেদের বিষ্ণুস্তুত্রেও দৃষ্ট হয় :—

“তমু স্তোতারঃ পূর্য্যং যথাবিদগ্নতস্ত গর্তং জহুবা পিপর্তন । আশ্র জ্ঞানস্তো নাম চিদ্ভিবল্লন্ মহন্তে বিষ্ণো জুমতিং ভজামহে । ১ । ২২ । ১৫৬ । ৩ ॥” সায়নাচার্য্য এই মন্ত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন :— হে স্তোতারঃ, তমু তমেব বিষ্ণুঃ পূর্য্যং পূর্য্যাইমনাদিসিক্তম্ ঋতস্ত গর্তং যজ্ঞস্ত গর্তভূতম্ । যজ্ঞান্নোৎপন্নমিত্যর্থঃ । যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ । শতং ১ । ১ । ২ । ১০ । ইতি ঋতেঃ । যদ্বা ঋতস্তোদকস্ত গর্তং গর্তকারণম্ । উদকোৎপাদকমিত্যর্থঃ । অপ এব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমর্জাদৌ। মনু ১।৮। ইতি স্মৃতিঃ। এবং ভূতং বিষ্ণুং যথা বিদ জানীথ তথা জহুবা জন্মনা স্বতএব ন কেনচিং বরলাভাদিনা পিপর্তন। স্তোত্রাদিনা শ্রীণয়ত। যাবদশু মহাত্মাং জানীথ তাবদিত্যর্থঃ। বিদের্লটি মধ্যমবহুবচনম্। বিদ শ্বতশ্চৈত্র সংহিতায়াম্ ত্যাক্ ইতি প্রকৃতিভাবঃ। কিং চাস্ত মহাত্ম্যভাবশু বিষ্ণোর্নাম চিং সর্কৈর্নমনীয়ম্ অভিধানং সার্বক্যাপ্রতিপাদকম্ বিষ্ণুরিতেতন্ময় জানন্তুঃ পুরুষার্থপ্রদমিত্যভিগচ্ছন্ত আ সমস্তাদ্ বিবক্তন। বদত। সঙ্কীর্তয়ত। যদ্বা নাম যজ্ঞাত্মনা নমনং বিষ্ণোরৈব সর্কেষাং স্বর্গাপবর্গসাধনায়েষ্টাণ্ডাত্মনা দ্রব্যাদেবতাঅন্য বা পরিণামম্ আ জানন্তো যুয়ং বিবক্তন। ক্রত। স্তুত। বচের্লেটি ছান্দসঃ শপঃ শ্লুঃ। বহলং ছন্দসীত্যাভ্যাসশ্চোহম্। পূর্ববক্তনাদেশঃ। ইদানীং সাক্ষাৎকৃত্যাহ। হে বিষ্ণো সর্কাত্মক দেব মহো মহতন্তে তব স্মৃতিং স্মৃতিং শোভাত্মিকাং বুদ্ধিং বা ভজামহে। সেবামহে বয়ং যজমানাঃ।

সায়নাচার্য্যাকৃত ব্যাখ্যাসারে উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এইরূপঃ—হে স্তবকারিগণ, বিষ্ণু অনাদিসিদ্ধ, তাঁহা হইতেই যজ্ঞের অথবা জলের উৎপত্তি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত। কাহারও বর বা অনুগ্রহলাভাদির অপেক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া না থাকিয়া জন্মদ্বারা আপনা হইতেই (অর্থাৎ জন্মহেতু যে জীবন লাভ করিয়াছে, সেই জীবনব্যাপী স্তোত্রাদিদ্বারা নিজের চেষ্টাতেই) তোমরা সেই বিষ্ণুর শ্রীতিবিধান কর—যাহাতে তোমরা তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পার। অধিকন্তু সেই সর্কাত্ম্য মহাত্ম্যের বিষ্ণুর নাম চিং (অ-জড়, অপ্রাকৃত), সকলেরই নমনীয় (প্রণয়) এবং সর্ক-পুরুষার্থপ্রদ—ইহা অবগত হইয়া তোমরা সম্যকরূপে তাঁহার নামকীর্তন কর। অথবা সকলের স্বর্গাপবর্গসাধন যজ্ঞাদি, বা সেই যজ্ঞাদির উপকরণ, অথবা সেই যজ্ঞাদির অধিষ্ঠাতা দেবতা—এসমস্ত সেই বিষ্ণুরই পরিণাম, ইহা সম্যকরূপে অবগত হইয়া তোমরা তাঁহার স্তব কর। হে বিষ্ণো, হে সর্কাত্মক দেব, উত্তমরূপে যেন তোমার স্তুতি করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা করি।

উল্লিখিত ঋক-মন্ত্রটির দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যা শ্রীজীব-গোস্বামী তৎকৃত ভগবৎ-সন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেনঃ—হে বিষ্ণো তব নাম চিং—চিংস্বরূপম্ অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্। তস্মাৎ অশ্রু নাম আ ঈষৎ অপি জানন্তুঃ নতু সম্যক্ উচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরস্বারেণ তথাপি বিবক্তন ক্রবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্কীণাঃ স্মৃতিং তদ্বিষয়াং বিজ্ঞাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ।—হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিং (চৈতন্যস্বরূপ) এবং সেজন্তু তাহা মহঃ (স্বয়ং-প্রকাশ); সেই হেতু সেই নামের ঈষৎ মহিমা জানিয়াও (উচ্চারণাদি ও মাহাত্ম্যাদি পূর্ণভাবে না জানিয়াও) নামের কেবল অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিলেও তোমাবিষয়ক বিজ্ঞা আমরা লাভ করিতে পারিব।

এইরূপে ঋগ্বেদ হইতে জানা গেল—ভগবানের নাম-কীর্তন সর্কপুরুষার্থ-সিদ্ধির উপায়, নাম-সঙ্কীর্তনের প্রভাবেই ভগবদ্বিষয়িণী বিজ্ঞা বা ভক্তি লাভ হইতে পারে। আরও জানা গেল—নাম জড়বস্তু নহে, ইহা চিদ্বস্তু, চৈতন্যরসবিগ্রহ; এবং চিদ্বস্তু বলিয়া নামীর ত্রায়ই স্বপ্রকাশ, নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে, অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে—দুর্কাসনায় সমাচ্ছন্ন জীবাত্মাকেও স্থায়-স্বরূপে আনয়ন করিয়া প্রকাশিত করিতে পারে। নাম চিদ্বস্তু বলিয়া—আগুনের শক্তি-আদি না জানিয়াও আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়িয়া যায় অর্থাৎ আগুন নিজের শক্তি প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয়না, তদ্রূপ—নামের মাহাত্ম্যাদি না জানিয়াও কেবল নামের অক্ষরগুলির উচ্চারণ করিয়া গেলেও ভগবদ্বক্ত লাভ হইতে পারে।

নামই যে শ্রেষ্ঠ সাধন, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রুতি-অনুসারে ওঙ্কারই (প্রণবই) ব্রহ্ম। “ওম্ ইতি ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়শ্রুতি। ১।৮।” কঠোপনিষৎ বলেন, ওম্—এই অক্ষরই পরব্রহ্ম; এই অক্ষরকে জানিলেই জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। “এতদ্ব্যোবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ব্যোবাক্ষরং পরম্। এতদ্ব্যোবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তশ্চ তৎ ॥ ১।২।১৬ ॥” প্রণব হইল ব্রহ্মের বাচক—একটি নাম। (পাতঞ্জল বলেন—ঈশ্বর-প্রবিধানায়া। তশ্চ বাচকঃ প্রণবঃ। সমাধিপাদ। ২৭ ॥—প্রণব ঈশ্বরের বাচক বা একটি নাম।) প্রণবকেই ব্রহ্ম বলায় নাম ও নামীর অভেদত্বই উক্ত কঠশ্রুতি প্রকাশ করিলেন। এইরূপে নাম ও নামীর অভেদত্ব প্রকাশ করিয়া উক্ত শ্রুতিই

কেবল-শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ ।

জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ম-আদি নিবারণ ॥ ২১

অন্থথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার ।

‘নাহি নাহি নাহি’ এ তিন এবকার ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বলিতেছেন—“এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্ । এতদালম্বনং জ্ঞান্না ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১।২।১৭॥” এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—“যত এবং অত এব এতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমম্ ।—এইরূপ বলিয়া (নাম-নামী অভিন্ন বলিয়া—১।২।১৬ শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়াছেন) ব্রহ্ম-প্রাপ্তির যত রকম আলম্বন আছে, তাহাদের মধ্যে ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ আলম্বন” । এইরূপে উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইল এই—ভগবৎ-প্ৰীতির যত রকম আলম্বন বা উপায় আছে, ওঙ্কারাঙ্করই হইল তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহার দ্বারা শ্রেষ্ঠ আলম্বন আর নাই । এই আলম্বনকে জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে (ভগবানের ধামে) মহীয়ান্ হইতে পারে (ভগবানের সেবা পাইয়া ধন্য হইতে পারে) । ওঙ্কার হইল ভগবানের নাম । ওঙ্কার (প্রণব) আবার মহাবাক্য বলিয়া ভগবানের অন্য সমস্ত নামই ওঙ্কারেরই অন্তর্ভুক্ত (১।৭।১২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । সুতরাং ওঙ্কার-শব্দে সমস্ত ভগবন্নামকেই বুঝায় । ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠ-আলম্বনত্বে সমস্ত ভগবন্নামেরই আলম্বনত্ব বুঝাইতেছে । নামই আলম্বন অর্থাৎ নামকীর্তনই অবলম্বনীয় উপায় বা সাধন । সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের নির্দেশ হইল এই যে, ভগবানের নামকীর্তনই তাঁহার প্রাপ্তির (সেবাপ্রাপ্তির) সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন । এই নামকে জানিতে পারিলে অর্থাৎ নামের স্বরূপ অনুভূত হইলে, নাম ও নামীর অভেদত্ব অনুভূত হইলে—ভগবদ্ধামে যাইয়া ভগবানের লীলায় তাঁহার সেবা পাইয়া কৃতার্থ হওয়ার যোগ্যতা জীব লাভ করিতে পারে । অতঃপর যে কোনও অভীষ্টও লাভ হইতে পারে—“যো যদৃ ইচ্ছতি তস্মৈ তৎ । কঠ । ১।২।১৬॥”

২১। কেবল-শব্দ—শ্লোকস্থ কেবল-শব্দ । পুনরপি—আবারও ; এব-শব্দদ্বারা একবার নিশ্চয়তা বুঝাইবার পরেও আবার । নিশ্চয়-কারণ—নিশ্চয়তা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে । বলিতে শ্রীহরিনামই যে একমাত্র গতি, এই তথ্যের নিশ্চয়তা এব-শব্দদ্বারা একবার বুঝাইয়াও অধিকতর নিশ্চয়তার জন্ত পুনরায় কেবল-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । কেবল-শব্দ প্রয়োগে ইহাও স্মৃতিত হইতেছে যে, একমাত্র হরিনামই কলির সাধন ; জ্ঞান, যোগ, তপস্বা বা কর্ম আদি কলিযুগের সাধন নহে । তাই বলা হইয়াছে—“জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ম-আদি নিবারণ—কেবল-শব্দদ্বারা জ্ঞান, যোগ, তপস্বা ও কর্ম-আদি কলির অনুপযোগী বলিয়া নিবারণিত (নিষিদ্ধ) হইতেছে । কেবলমাত্র হরিনামই কলির উপযোগী সাধন ।”

২২। অন্থথা যে মানে—যে ব্যক্তি অন্তরূপ মানে বা মনে করে । “হরিনামই কলির একমাত্র সাধন, জ্ঞান-যোগ-তপস্বাদি কলির উপযোগী নহে”—একথা যে ব্যক্তি স্মীকার করে না । তার নাহিক নিস্তার—তাঁহার নিস্তার (সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার) নাই । হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া (হরিনামের উপলক্ষণে ভক্তি-মার্গের আনুকূল্য গ্রহণ না করিয়া) যাহারা জ্ঞান-যোগাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা জ্ঞানযোগাদির ফল—সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি—পাইতে পারেন না ; কারণ, ভক্তিশাস্ত্রানুসারে, ভক্তিমার্গের সাহচর্য্য ব্যতীত জ্ঞান-যোগাদি নিজ নিজ ফলও প্রদান করিতে পারেনা । “ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক—কর্মযোগ জ্ঞান ॥ এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল । কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥ ২।২২।১৪-১৫ ॥” এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে এবং ভূমিকায় অভিধেন-তত্ত্বে দ্রষ্টব্য । নাহি নাহি নাহি ইত্যাদি—হরেনাম-শ্লোকে তিনবার “নাস্ত্যেব” বলা হইয়াছে ; “নাস্তি” শব্দের সহিত “এব” যোগ করিলেই সন্ধিতে “নাস্ত্যেব” হয় । “নাস্তি” শব্দের অর্থ—নাই ; আর “এব”-শব্দ নিশ্চয়্যাক্ষক ; সুতরাং “নাস্ত্যেব”-শব্দের অর্থ হইল—“নাই-ই” “নিশ্চয়ই নাই ।” তিনবার “নাস্ত্যেব”-শব্দের অর্থ—নাই-ই, নাই-ই নাই-ই । অর্থাৎ হরিনাম ব্যতীত কলিতে যে জ্ঞানযোগ-কর্মাদি অন্ত সাধন নাই-ই, যাহারা একথা বিশ্বাস করে না, তাহাদেরও যে নিস্তার নাই—ইহা নিশ্চিত দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার নিমিত্তই “নাস্ত্যেব”-শব্দ তিনবার বলা হইয়াছে ।



তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।  
 আপনি নিরভিমानी, অগ্রে দিবে মান ॥ ২৩  
 তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।  
 ভৎসন-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে ॥ ২৪

কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।  
 শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয় ॥ ২৫  
 এইমত বৈষ্ণব কা'রে কিছু না মাগিব।  
 অঘাচিতবৃত্তি কিস্মা শাক-ফল খাইব ॥ ২৬

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩। হরিনাম করা ব্যতীত অল্প উপায় নাই, তাহা বলা হইল; কিন্তু কিরূপে হরিনাম করিতে হয়, কিরূপে নাম করিলে হরিনামের মুখ্য ফল পাওয়া যায়, তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে।

**তৃণ হৈতে**—তৃণ সাধারণতঃ নীচ হইয়াই থাকে, মাটিতেই পড়িয়া থাকে, কাহাকেও আক্রমণ করে না। কিন্তু যদি কেহ তৃণের এক প্রান্তে পা দেয়, তাহা হইলে কখনও কখনও অপর প্রান্তকে মাথা তুলিতে দেখা যায়; এইরূপে মাথা তুলিলে আর তৃণের নীচতা থাকে না। কিন্তু যিনি যথারীতি হরিনাম করিবেন, তাঁহার এরূপ হইলে চলিবে না; কেহ তাঁহার গায়ে পা দিলে, কেহ তাঁহাকে রুঢ় কথা বলিলে, বা কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও তিনি সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন, তৃণের ন্যায় মাথা তুলিতে পারিবেন না, কথা বলিতে পারিবেন না, বা অগ্নের ব্যবহারের কোনও রূপ প্রতিশোধ লইতে পারিবেন না; এমন কি কাহারও অগ্নায় কথার বা ব্যবহারের প্রতিশোধ লওয়া ত দূরের কথা, প্রতিশোধের ভাবও তাঁহার মনে আনিতে পারিবেন না, কোনওরূপ কষ্টও মনে স্থান দিতে পারিবেন না। তিনি কোনরূপেই বিচলিত হইতে পারিবেন না—এইরূপ হইতে পারিলেই “তৃণ হইতে নীচ” হওয়া যায়; এইরূপ হইতে না পারিলে নামের পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। **অথবা**—“তৃণ অতি তুচ্ছ পদার্থ, কিন্তু সেই তৃণও গবাদির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। গৃহাদি নিৰ্ম্মাণের সহায়তা করিয়া তৃণ লোকেরও অনেক উপকার করিতেছে। প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তৃণদ্বারা ভগবৎ-সেবারও আনুকূল্য হইতেছে। কিন্তু আমাদ্বারা কাহারও উপকারও সাধিত হইতেছে না, ভগবৎ-সেবারও কোনওরূপ আনুকূল্য হইতেছে না, স্মরণ্য আমি তৃণ অপেক্ষাও অধম, আমার মত অধম আর কেহ নাই”—ইত্যাদি ভাবিয়া সাধক নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হেয় মনে করিবেন।

**আপনি নিরভিমानी**—নিজে কখনও কোনও অভিমান পোষণ করিবে না, কখনও কাহারও নিকট সম্মান পাওয়ার আশা করিবে না; এমন কি সাধারণের চক্ষে যে নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিচিত, তাহার নিকটও সম্মান পাওয়ার আশা মনে স্থান দিবে না; অথচ সকলকেই সম্মান করিবে—সাধারণের চক্ষে যে নিতান্ত নীচ, তাহাকেও সম্মান করিবে। “জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। ৩।২০।২০।”

২৪-২৬। **তরু—গাছ। তরুসম সহিষ্ণুতা**—বৈষ্ণবকে তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে হইবে। কতলোক গাছের উপর চড়িয়া বসে, গাছের ডাল ভাঙ্গে, পাতা ছিঁড়ে, আরও কত উৎপাত করে, কিন্তু গাছ কাহাকেও কিছু বলে না; অকাতরে সমস্ত সহ্য করে। এমন কি যাহারা গাছের ফল খায়, গাছের ছায়া উপভোগ করে, তাহারাও যদি গাছের প্রতি এরূপ ব্যবহার করে, তথাপি গাছ কিছু বলে না। বৈষ্ণবকেও এইরূপ হইতে হইবে। লোকে মন্দ বলুক, তাড়না করুক, মারুক, কাটুক, অকৃতজ্ঞতা দেখুক, তথাপি কিছু বলিবে না, অম্মান-বদনে সমস্ত সহ্য করিবে। হরিদাস-ঠাকুরকে—যবনেরা বাইশবাজারে বেত্রাঘাত করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি তাহাদের প্রতি কষ্ট হন নাই, বরং ভগবানের নিকট তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন।

**শুকাইয়া মৈল** ইত্যাদি—বৈষ্ণবকে তরুর ন্যায় অঘাচক হইতে হইবে। জলের অভাবে গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়, তথাপি কাহারও নিকট জল ভিক্ষা করে না। বৈষ্ণবও কাহারও নিকটে কিছুর জন্ত ভিক্ষার্থী হইবে না—অঘাচিত ভাবে বাহা পাওয়া যায়, তদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, অথবা ফল মূল বা শাক সব্জী—যাহা অগ্নের ক্ষতি না করিয়া অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিবে।

সদা নাম লইব যথা লাভেতে সন্তোষ ।

এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

মৈলে—মরিয়া গেলেও । না নাগয়—যাচঞা করেনা, প্রার্থনা করেনা । বৃত্তি—জীবিকানির্বাহের উপায় । অযাচিত বৃত্তি—কাহারও নিকটে কিছু যাচঞা না করিয়া, মনে মনেও কাহারও নিকটে কিছু প্রাপ্তির আশা পোষণ না করিয়া, আপনা আপনি যাহা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা দ্বারা—জীবিকা নির্বাহ করা । শাক-ফল—যখন অযাচিত ভাবে কিছু পাওয়া না যায়, তখন শাক-সবজী আদি বা ফল-মূলাদি, যাহা বনে-জঙ্গলে যেখানে-সেখানে জন্মে ও পাওয়া যায় এবং যাহা অপর কাহারও কোনওরূপ ক্ষতি না করিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা খাইয়াই বৈষ্ণব জীবন ধারণ করিবে ।

২৭-১। সদা নাম লৈবে—সর্বদাই হরিনাম গ্রহণ করিবে, কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিবে না ; কিছু খাইতে পাওয়া গেলেও নাম কীর্তন করিবে, পাওয়া না গেলেও করিবে । যথা-লাভেতে সন্তোষ—যখন যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে ; আহারের বা ব্যবহারের জন্য ভাল জিনিস পাওয়া না গেলে বা উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া না গেলেও কখনও অসন্তুষ্ট হইবে না । একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে । বাল্যকালে এক বাবাজীকে দেখিয়াছি ; উজ্জল গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, আয়ত স্থির চক্ষু ; এক খুব বড় দীঘির পাড়ে লোকালয় হইতে একটু দূরে—এক পর্ণকুটীরে তিনি থাকিতেন ; বালগোপালের সেবা ছিল । তাঁহার আশ্রমের বাহিরে—কোথায়ও কখনও তিনি যাইতেন না ; কখনও কাহারও নিকটে কিছু চাহিতেন না ; কুটীরে বসিয়া সর্বদা ভজন করিতেন ; লোকে ইচ্ছা করিয়া খুব শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে চাউল তরকারী দিয়া যাইত ; সকল দিনই যে পাওয়া যাইত তাহা নহে । যেদিন কিছুই পাওয়া যাইত না, সেই দিন—তাঁহার আশ্রমে একটা বাদাম গাছ এবং দুই তিনটা পেয়ারা গাছ ছিল—যেদিন কোনও স্থান হইতে ভোগের কোনও জিনিস আসিত না, সেই দিন—গাছের নীচে দু'একটা বাদাম পাওয়া গেলে, তাহাই গোপালকে নিবেদন করিয়া দিতেন, আর না হয় পেয়ারা পাওয়া গেলে দু'একটা পেয়ারা নিবেদন করিয়া অবশেষ পাইতেন । যেদিন তাহাও পাওয়া যাইত না, সেই দিন কেবল জল-তুলসী দিয়াই গোপালের শয়ন দিতেন । কিন্তু এরূপ অভাবের সময়েও তিনি কাহারও নিকট কিছু যাজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া, কিম্বা কখনও মুখ অগ্রসর করিয়াছেন বলিয়া কেহ বলিতে পারিত না ; সর্বদাই তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত । এইত আচার—২৩-২৭ পর্যায়োক্ত আচরণ । ভক্তি-ধর্ম পোষ—ভক্তি-ধর্মের পোষণ করে ; উক্ত প্রকার আচরণের সহিত শ্রীহরিনাম কীর্তন করিলেই চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া ক্রমশঃ চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হইতে পারে ।

১২-২৭ পর্যায় “হরেনাম”—শ্লোকের অর্থবিবরণ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি ।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, প্রথমেই কেহ তৃণ হইতে নীচ হইতে পারে না, প্রথমেই কেহ স্বয়ং নিরতিমান হইয়া অপরকে সম্মান করিতে পারে না, প্রথমেই কেহ তরুর ছায় সহিষ্ণু হইতে পারে না ; কারণ, এসব গুণ সাধন-সাপেক্ষ । এসব না হইলেও হরিনামের ফল হইবে না ; তাহা হইলে উপায় কি ? উত্তর—“হরেনাম”—এই শ্লোকের প্রমাণ অনুসারে কলিতে যখন অল্প কোনও গতিই নাই, তখন জীব যে ভাবেই থাকুক না কেন, সেই ভাবেই প্রথমে নাম গ্রহণ করিবে, নামের প্রভাবেই তৃণ হইতে নীচ হইবে, তরুর ছায় সহিষ্ণু হইবে । অবশ্য প্রথম হইতেই তৃণ হইতে নীচ, তরুর ছায় সহিষ্ণু হওয়ার জন্য একটা তীব্র ইচ্ছা রাখিতে হইবে, তদনুকূল যত্ন এবং অভ্যাসও করিতে হইবে ; তাহা হইলেই নামের প্রভাবে ঐ সমস্ত গুণ আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং নামের প্রভাবে ঐ সমস্ত গুণের অধিকারী হইলে তারপর হরিনামের ফল প্রেম প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । ( পরবর্তী পরায়ের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য ) ।

তথাহি—

পদ্মাবল্যাং ( ৩২ ) শ্রীমুখশিক্ষাগ্লোকঃ—

তুণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৪

উদ্ধবাহু করি কহি শুন সর্বলোক।—

নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তুণাদপীতি। তুণাদপি-সুনীচেন—যথা তুণং সর্কেষাং পদদলনেনাপি অক্ষুণ্ণতাং নীচতাং চ প্রকটয়তি তন্মাদপি সুনীচেন হিংসারহিতেনাভিমানহীনেনচ, তরোরিব বৃক্ষবৎ সহিষ্ণুনা সহনশীলেন, তদ্বৎ স্বাক্ষেদকানপি জনান্ প্রতি ন রুষ্টো ভবতি তথা স্বদ্রোহকারকান্ প্রতাপি রোষরহিতেন, স্বয়ং অমানিনা সম্মানবিষয়ে অভিলাষশূন্যেন, অগ্ৰেভ্যঃ সম্মানং দদাতীতি তেন জ্ঞেনে সদা হরিঃ কীর্তনীয়ঃ ভবেৎ। হরিকীর্তনকারিণা তুণাদপি সুনীচত্বাদিকমাত্মনো বিধাতব্যমিতি ভাবঃ। ৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪। অম্বর। তুণাদপি ( তুণ অপেক্ষাও ) সুনীচেন ( সুনীচ ) তরোরিব ( তরুর ত্রায় ) সহিষ্ণুনা ( সহিষ্ণু ) অমানিনা ( সম্মানের জন্তু অভিলাষশূন্য ) মানদেন ( অপরের প্রতি সম্মান-প্রদানকারী ) [ জ্ঞেনে ] ( ব্যক্তিদ্বারা ) হরিঃ ( হরি—শ্রীহরিনাম ) সদা ( সর্বদা ) কীর্তনীয়ঃ ( কীর্তনীয় )।

অনুবাদ। তুণ হইতেও নীচ হইয়া, বৃক্ষের মতন সহিষ্ণু হইয়া, নিজে সম্মান লাভের অভিলাষ না করিয়া এবং অপর সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া সর্বদা হরি-কীর্তন করিবে। ৪।

পূর্ববর্তী ২৩-২৭ পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোক, স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত। যে ভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে, তাহার উপদেশরূপেই প্রভু এই “তুণাদপি”—শ্লোক বলিয়াছেন।

২৮। উদ্ধবাহু করি—তুই বাহু উর্দ্ধে ( উপরের দিকে ) তুলিয়া। বহুদূর পর্যন্ত বহুলোককে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে হইলে লোকে সাধারণতঃ উপরের দিকে হাত তুলিয়া উচ্চস্বরে তাহা বলিয়া থাকে; উদ্ধবাহু দেখিয়া বক্তার দিকে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তাহার উচ্চস্বর দূরবর্তী লোকেরও ( এবং গোলমালস্থানেও সকলের ) শ্রতিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী তুণাদপি শ্লোকের প্রতি সকলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন—“আমি যাহা বলিতেছি, সকলে সাবধানে শুন; এই তুণাদপি-শ্লোকটীকে নামরূপ-সূত্রদ্বারা মালার ত্রায় গাঁথিয়া সকলে কণ্ঠে ধারণ কর—অর্থাৎ সর্বদা এই শ্লোক স্মরণ রাখিয়া শ্লোকের মর্মাত্মসারে বা শ্লোকের উপদেশাত্মসারে—তুণাদপি সুনীচ আদি হইয়া—সর্বদা শ্রীহরিনাম কীর্তন করিবে।” নামসূত্রে—হরিনামরূপ সূত্র ( সূতা ) দ্বারা; শ্রীহরিনামকীর্তনরূপ সূত্রদ্বারা গাঁথি—গাঁথিয়া। এই শ্লোক—এই তুণাদপি শ্লোক। পর কণ্ঠে—কণ্ঠে ( গলায় ) পরিধান কর; হার বা মালার ত্রায় কণ্ঠে ধারণ কর। ধনি এই যে, মালা বা হার কণ্ঠে ধৃত হইলে যেমন দেহের শোভা বদ্ধিত হয়, তদ্রূপ নামরূপ সূত্রে গ্রথিত হইয়া এই তুণাদপি শ্লোক কণ্ঠে ধৃত হইলেও নামগ্রহণ-কারীর শোভা বদ্ধিত হয়। কতকগুলি মালাকে একত্রে গাঁথিয়া গলার ধারণ করিতে হইলে সূত্রের দরকার; এই পয়ার হইতে জানা যায়, তুণাদপি শ্লোকটীকে মালার ত্রায় গাঁথিতে হইলে যে সূত্রের ( বা সূতার ) দরকার, নামকীর্তনই হইতেছে সেই সূত্র। তুণাদপি শ্লোকে চারিটি বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়—তুণ অপেক্ষাও সুনীচতা, তরুর ত্রায় সহিষ্ণুতা, নিজের জন্তু সম্মানের অভিলাষ-শূন্যতা ( অমানিত্ব ) এবং অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ( মানদত্ত ) ; এই চারিটি বস্তুকে তুণাদপি শ্লোকের চারিটি পৃথক পৃথক মালা মনে করা যায়; নামকীর্তনরূপ সূত্রদ্বারা গাঁথিলে এই চারিটি মালা একসঙ্গে পাশাপাশি থাকিয়া এক ছড়া মালায় পরিণত হয়, তাহা নামগ্রহণকারীর কণ্ঠের ভূষণ হইতে পারে—ইহাই এই পয়ার হইতে জানা যায়। সূত্রের সহায়তায় যেমন পৃথক পৃথক মালাগুলি একত্রে গ্রথিত হয়, তদ্রূপ নামকীর্তনের সহায়তায় তুণ-অপেক্ষাও সুনীচতাদি চারিটি পৃথক

প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ ।

অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ২৯

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর ।

রাত্রে সঙ্কীর্তন কৈল এক সংবৎসর ॥ ৩০

কবাট দিয়া কীর্তন করে পরম আবেশে ।

পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

পৃথক বস্তু একত্রিত হইয়া—যুগপৎ একই স্থানে অবস্থান করিয়া—নাম-গ্রহণকারীর শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে । ব্যঞ্জনা এই যে, যিনি নিষ্ঠা সহকারে সর্বদা নাম কীর্তন করিবেন, ঐ নামকীর্তনের প্রভাবেই—ঐ নামকীর্তনকে আশ্রয় করিয়াই—তৃণাদপি স্ননীচতাদি চারিটি বস্তু—কৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তির উপযোগী চারিটি গুণ—নামগ্রহণকারীর মধ্যে প্রকটিত হইবে ; তখন নামকীর্তনের প্রভাবে তাঁহার চিত্তের সমস্ত মলিনতা সম্যক্রূপে দূরীভূত হইয়া যাইবে, তাঁহার চিত্ত তখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করিবে এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে চিত্ত প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়া নামগ্রহণকারীর শোভা বর্দ্ধন করিবে । এইরূপে, কি উপায়ে তৃণাদপি স্ননীচ হওয়া যায়, তাহারই ইঙ্গিত এই পয়ারে পাওয়া যায় । ( পূর্ববর্তী ২৭ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য ) ।

“সর্বলোক”-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “ভক্ত-লোক”-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ।

২৯ । প্রভুর আজ্ঞায়—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে । শিক্ষাষ্টকে (অন্ত্যালীলার ২০শ পরিচ্ছেদে) শ্রীমন্মহাপ্রভু এই তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুসারে হরিনাম কীর্তন করার জন্ত সকলকে আদেশ করিয়াছেন ; প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—এই ভাবে হরিনাম করিলেই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় । এই শ্লোক আচরণ—এই তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুসারে আচরণ অর্থাৎ তৃণাদপি স্ননীচ-আদি হইয়া শ্রীহরিনামসঙ্কীর্তন । অবশ্য পাইবে ইত্যাদি—তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুসারে হরিনামকীর্তন করিলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা পাওয়া যায়, ইহাতে কোনওরূপ সন্দেহ নাই ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন, ঐভাবে নাম-কীর্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় এবং কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া গেলেই কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় । শ্রীকৃষ্ণচরণ—শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা । সেবা-প্রাপ্তিতেই চরণ-প্রাপ্তি । কিরূপে তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুরূপ যোগ্যতা লাভ করা যায়, ২৮ পয়ারে তাহার ইঙ্গিত দিয়া ২৯ পয়ারে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন—“সকলেই তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুসারে হরিনামকীর্তন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না ; কারণ, ইহা স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—তাঁহারই আদেশ ।”

২৮, ২৯ পয়ারদ্বয়, ১২—২৭ পয়ারোক্ত মহাপ্রভুর উক্তি-প্রসঙ্গে, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি ।

৩০ । ১৮ পয়ারের পরে প্রসঙ্গক্রমে হরেন্দ্রনাম-শ্লোকের অর্থ-বিবরণ বলিয়া এক্ষণে আবার প্রস্তাবিত বিষয়—সুত্ররূপে মহাপ্রভুর ঘোষন-লীলার উল্লেখ—আরম্ভ করিতেছেন । ১৮ পয়ারের সঙ্গে ৩০ পয়ারের সম্বন্ধ । গৃহে—অঙ্গনে । নিরন্তর—নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতি রাত্রিতে । এক সংবৎসর—সম্পূর্ণরূপে এক বৎসর । কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য হইতে জানা যায়, গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে ( ১৪৩০ শকের ) মাঘ মাসের প্রথমভাগ হইতে মহাপ্রভু কীর্তনরস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন ( ৪৭৬ ) । সন্ন্যাসগ্রহণের নিমিত্ত প্রভুর গৃহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিরাত্রিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কীর্তন চলিয়াছিল । ১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিতে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন । সুতরাং বারমাসের কয়েকদিন বেশী সময়—মোটামুঠীভাবে সম্পূর্ণ একবৎসরকাল-ব্যাপিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর সঙ্কীর্তনলীলা অমুষ্ঠিত হইয়াছিল ।

৩১ । কবাট দিয়া—কপাটের অর্গল বন্ধ করিয়া, যেন বাহির হইতে কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে । পরম আবেশে—একান্তভাবে আবিষ্ট হইয়া । পাষণ্ডী—কীর্তন-বিদ্বেষী বহির্গৃহ লোকগণ । হাসিতে আইসে—উপহাস করিতে বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে আসে । না পায় প্রবেশ—কপাট বন্ধ থাকে বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না ।



কীৰ্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে ।

শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রাত্যহিক রাত্রি-কীৰ্ত্তন ব্যতীতও প্রভু নদীয়ার রাজপথাদিতে কীৰ্ত্তন প্রচার করিতেছিলেন ; নবদ্বীপের কতকগুলি লোক এইরূপ কীৰ্ত্তনের অত্যন্ত বিরোধী ছিল ; তাহারা সৰ্বদাই এই কীৰ্ত্তনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিত, কীৰ্ত্তনকারীদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, কীৰ্ত্তন নষ্ট করার জ্ঞাও নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিত । মহাপ্রভু এসমস্ত জানিয়াও কীৰ্ত্তনে নিরুৎসাহ হন নাই ; বরং এসমস্ত বহির্গুণ লোকদিগকে কীৰ্ত্তনের প্রতি উন্মুখ করার উদ্দেশ্যে কীৰ্ত্তনের দল লইয়াই কখনও কখনও তাহাদের সম্মুখীন হইতেন এবং তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং বিরুদ্ধাচরণাদিকে উপেক্ষা করিয়াও তাহাদের সম্মুখে কীৰ্ত্তন করিতেন ; কারণ, প্রভুর এই সমস্ত কীৰ্ত্তনের একটি উদ্দেশ্যই ছিল—বহির্গুণ লোকদিগকে অন্তর্গুণ করা । কিন্তু শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর কীৰ্ত্তন হইত তাঁহার নিজের এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আশা-দনের জ্ঞা—প্রচার কিম্বা বহির্গুণ লোকদিগকে অন্তর্গুণ করাই শ্রীবাস-অঙ্গনের কীৰ্ত্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না ; তাই তাঁহার সহিত সমভাবাপন্ন অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণকে লইয়াই প্রভু এই কীৰ্ত্তন করিতেন ; বাহিরের লোকদিগকে, কিম্বা কীৰ্ত্তন-বিরোধী বহির্গুণ লোকদিগকে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীৰ্ত্তন-স্থলে যাইতে দেওয়া হইত না ; কারণ, বাহিরের লোক প্রেমাবেশ-জন্মিত ভাব-ভঙ্গীর রহস্য জানিত না বলিয়া তাদৃশ ভাব-ভঙ্গীকে হয়তো বিকৃত-মস্তিষ্ক উন্নতের চেষ্টা মনে করিয়া কীৰ্ত্তনের প্রতি এবং কীৰ্ত্তনকারীদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিয়া তাহাদের অপরাধী হওয়ার আশঙ্কা ছিল ; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের মনোগত ভাব প্রকাশে ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেও কীৰ্ত্তনকারীদের ভাবধারা ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল । আর যাহারা স্বভাবতঃই কীৰ্ত্তন-বিরোধী, কীৰ্ত্তন ও কীৰ্ত্তনকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই তাহারা কীৰ্ত্তনস্থলে আসিত ; তাহারা প্রবেশ করার সুযোগ পাইলে, তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং সমালোচনার উৎপাতে কীৰ্ত্তনানন্দ উপভোগ করার সম্ভাবনাই থাকিত না । যাহাতে সপার্বদ শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিরুপদ্রবে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীৰ্ত্তনের রসান্বাদন করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যেই কীৰ্ত্তনারম্ভের পূর্বেই অঙ্গনের সদর-দরজার কপাট বন্ধ হইত—যেন অপর লোক প্রবেশ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে । কীৰ্ত্তনানন্দ-উপভোগের সৌভাগ্য হইতে বহির্গুণ লোকদিগকে বঞ্চিত করাই কপাট বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না—তাহাদের উৎপাত হইতে কীৰ্ত্তনানন্দের নির্বিঘ্নতা রক্ষা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল । বস্তুতঃ বহির্গুণ লোকগণ এক মাত্র ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই কীৰ্ত্তন-সময়ে শ্রীবাস-অঙ্গনের দিকে আসিত ; কিন্তু কপাট বন্ধ থাকায় তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দুর্বভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে পারিত না ।

৩২ । বাহিরে থাকিয়াই—ভিতরের কীৰ্ত্তন শুনিয়া—তাহার কোনও বিঘ্ন জন্মাইতে পারিতেছে না বলিয়া, তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধ-সমালোচনা কীৰ্ত্তন-সময়ে কীৰ্ত্তনকারীদের কর্ণগোচর করিতে পারিতেছে না বলিয়া, হিংসায় ও বিদ্বেষে—বহির্গুণ লোকগণ বাহিরে থাকিয়াই রুদ্ধ আক্রোশের জ্বালায় যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত । কীৰ্ত্তনকারীদের মধ্যে অপর-কাহারও কিছুই করিতে পারিবে না ভাবিয়া ( বা জানিয়া ) শেষকালে শ্রীবাসকে দুঃখ দেওয়ার জ্ঞা—অঙ্গ করার জ্ঞা—তাহারা নানাবিধ যুক্তি, নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল । শ্রীবাসের বিরুদ্ধে বিশেষ আক্রোশের হেতু ছিল এই যে—“যাহা কেহ কোনও দিন দেখে নাই, শুনে নাই,—যাহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র, তদ্র অভদ্র সকলেই এক সঙ্গে হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া নিরীহ নগরবাসীদের স্নানদ্রাব ও শাস্তির বিঘ্ন জন্মায়—এমন দেশরাজ্য-ছাড়া কীৰ্ত্তন—শ্রীবাস কেন তাহার বাড়ীতে হইতে দেয় ? আর দেয় তো, তাহাদিগকে কেন সে স্থানে প্রবেশ করিতে দেয় না ?”—ইহাই ছিল পাষণ্ডীদের মনোগত ভাব ।

একদিন বিপ্র—নাম গোপালচাপাল ।

পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল ॥ ৩৩

ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া ।

রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥ ৩৪

কলার পাত উপরে খুইল ওড়ফুল ।

হরিদ্রা সিন্দূর আর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥ ৩৫

মণ্ডভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘর গেলা ।

প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস তাহা ত দেখিলা ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

৩৩ ৩৪ । পাষণ্ডীগণ ষড়যন্ত্র করিয়া ক্রীড়ে এক রাত্রে শ্রীবাসের বাড়ীর সম্মুখে মণ্ডভাণ্ড রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাই বলা হইতেছে ।

গোপাল চাপাল—নবদ্বীপবাসী একজন ব্রাহ্মণ ; তাঁহার নাম ছিল গোপাল । বিদ্যোদ্ধত্যে ইনি খুব চপলতা করিতেন বলিয়াই নাকি ইহাকে চাপাল বলা হইত ; সাধারণতঃ গোপাল-চাপাল নামেই ইনি পরিচিত ছিলেন । কীর্তন-বিরোধী পাষণ্ডীদের মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্বপ্রধান । দুর্মুখ—যে খুব খারাপ কথা বলে ; কটুভাষী । বাচাল—যে খুব বেশী কথা বলে । গোপাল-চাপাল খুব দুর্মুখ ও বাচাল ছিলেন । ভবানী—শিবের পত্নী ; ভগবতী । সামগ্রী—পূজার উপকরণ । শ্রীবাসের দ্বারে—শ্রীবাসের বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখে বাহিরে । ওড়ফুল—জবাফুল ; ভবানী-পূজায় জবাফুল লাগে । হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন এবং তণ্ডুলও ( চাউলও ) ভবানী-পূজার উপকরণ । শ্রীনিবাস—শ্রীবাস ।

শিবপত্নী ভবানী পরমাবৈষ্ণবী ; মণ্ড তাঁহার পূজার উপকরণ হইতে পারে না । গোপাল-চাপাল পাষণ্ডী বলিয়া পূজোপকরণের সঙ্গে মণ্ডভাণ্ড রাখিয়াছিল ।

ভবানী-শব্দে শিবপত্নীকে বুঝাইলেও এস্থলে ভবানীপূজা বলিতে শিবপত্নীর পূজাই গ্রন্থকারের অভীষ্ট বলিয়া মনে হয় না । মূলের পয়্যারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়—বর্ণিত ভবানীপূজা শিষ্ট ভাব্যলোকদের নিকটে অত্যন্ত নিন্দিত ছিল । পরবর্ত্তী ৩৮ পয়্যারে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া “বড় বড় লোক সব”কে বলিতেছেন—“নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন । আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণসজ্জন ॥” শ্রীবাসের এই উক্তিতে ভবানীপূজা-সম্বন্ধে একটা ঘৃণার ভাব স্পষ্ট । জগজ্জননী ভগবতীর পূজা-সম্বন্ধে ঘৃণার ভাব কেহই পোষণ করিতে পারেননা । চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জননীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া ভক্তবৃন্দকে মাতৃ-ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং জগজ্জননীরূপ ধারণ করিয়া সকলকে স্বীয় স্তম্ভপানও করাইয়াছিলেন । এতাদৃশী জগজ্জননীর পূজার প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করা বিশ্বাসযোগ্য নহে । তাই মনে হয়, গ্রন্থকার যে ভবানীপূজার কথা এস্থলে বলিয়াছেন, তাহা শিবপত্নী-ভবানীর পূজা নহে । অসম্মান হয়, মণ্ডপেরা হয়তো মণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী কোনও এক দেবতার কল্পনা করিয়া তাহাকেই ভবানী বলিত এবং মণ্ডপূর্ণ ভাণ্ডে এই ভবানীরই পূজা ( বা পূজার অভিনয় ) করিত । মণ্ডভাণ্ডই এই ভবানীর প্রতীক এবং এই ভবানী শিবপত্নী ভবানী নহেন । এই ভবানীর পূজা বস্তুতঃ মণ্ডেরই পূজা । মণ্ডপব্যতীত অণ্ড কেহ এই পূজা করিত না । তাই ইহা শিষ্ট-লোকদের নিকটে ঘৃণিত ছিল ।

এক রাত্রিতে গোপাল-চাপাল শ্রীবাসের সদর দ্বারের সম্মুখে বাহিরে কতটুকু জায়গা লেপাইয়া সেই স্থানে এক খানা কলার পাতা পাতিয়া তাহার উপরে জবাফুল, হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন এবং চাউল প্রভৃতি ভবানী-পূজার উপকরণাদি সাজাইয়া রাখিল এবং তাহার পাশে এক ভাণ্ড মণ্ড রাখিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেল । সেই রাত্রিতে অপর কেহ ইহা দেখে নাই ; কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই শ্রীবাস সমস্ত দেখিতে পাইলেন ।

এই ভবানীর নৈবেদ্য-সজ্জায় গোপাল-চাপালের বোধ হয় একটা হীন গূঢ় উদ্দেশ্যও ছিল । গোপাল-চাপাল রাত্রির অন্ধকারে গোপনে এই নৈবেদ্য সাজাইয়া গিয়াছে ; কেহ তাহাকে দেখে নাই ; তাহার উদ্দেশ্য

বড়বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া ।  
 সভারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া—॥ ৩৭  
 নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন ।  
 আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ-সজ্জন ॥ ৩৮  
 তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার—।  
 ঐছে কর্ম এথা কৈল কোন্ দুরাচার ? ॥ ৩৯

‘হাড়ি’ আনাইয়া সব দূর করাইল ।  
 জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥ ৪০  
 তিনদিন বই সেই গোপাল-চাপাল ।  
 সর্বদা হইল কুষ্ঠ—বহে রক্তধার ॥ ৪১  
 সর্বদা বেড়িল কীটে—কাটে নিরন্তর ।  
 অসহ বেদনা চুখে জ্বলে অস্তর ॥ ৪২

গৌর-রূপা-ভরঙ্গিণী টীকা ।

ছিল—প্রাতঃকালে—যাহারা মগ্ধভাণ্ডসহ নৈবেদ্য দেখিবে, তাহারাই মনে করিবে—শ্রীবাসই এই নৈবেদ্য সাজাইয়াছে; শ্রীবাস মগ্ধপ, তাই ভবানী-পূজায় মগ্ধভাণ্ড দিয়াছে, ভবানী-পূজার ছলে মগ্ধপানই শ্রীবাসের উদ্দেশ্য । গোপাল-চাপালের হয়তো ইহাও ভরসা ছিল যে, ভবানীর নৈবেদ্যের সহিত মগ্ধভাণ্ড দেখিয়া লোকে মনে করিবে, কেবল শ্রীবাসই নহে, শ্রীবাসের অঙ্গনে রাত্রিতে দ্বার বন্ধ করিয়া যাহারা কীর্তন করে, তাহাদের সকলেই মগ্ধপ—মগ্ধপান করিয়া উন্নত হইয়া কীর্তন করে বলিয়াই লোক-লোচনের নিকট হইতে মগ্ধপানের বীভৎসতা গোপন করার উদ্দেশ্যে তাহারা দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়; অপর লোককে প্রবেশ করিতে দেয় না ।

৩৬ পয়ারে “শ্রীনিবাস তাহাত দেখিল”—স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “শ্রীবাস তাহা দ্বারেতে দেখিল”—এইরূপ পার্থক্য আছে । “শ্রীবাস” পাঠই সমীচীন মনে হয় ।

৩৭-৩৮ । প্রাতঃকালে শ্রীবাস এই অদ্ভুত ভবানী-নৈবেদ্য দেখিয়া স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলেন এবং যে পাষাণ এই হীন মড়ক করিয়াছে, তাহার মনোগত ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়াই যেন হাসিতে হাসিতে উপহাসের স্বরে বলিলেন—“দেখুন আপনারা সকলে আমার কাণ্ড; আমি প্রত্যহই রাত্রিতে মগ্ধপূর্ণ ভাণ্ড দ্বারা ভবানীপূজা করিয়া থাকি; নচেৎ আমার দ্বারে মগ্ধভাণ্ডযুক্ত ভবানী-নৈবেদ্য থাকিবে কেন? ব্রাহ্মণ-সজ্জন সকলে আমার মহিমা দেখুন ।”

শ্রীবাসও ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন; কিন্তু মগ্ধপান তো দূরের কথা, মগ্ধ স্পর্শ করাও ব্রাহ্মণ-সজ্জনের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল ।

৩৯-৪০ । শিষ্ট-লোক—ভব্য সজ্জন লোকসকল । হাহাকার—বিস্ময় ও আক্ষেপসূচক শব্দ । দুরাচার—হীনাচার, হীনগ্রন্থতির লোক । হাড়ি—নীচ জাতীয় লোকবিশেষ । জল-গোময়—জলের সহিত গোময় গুলিয়া । উচ্চজাতির পক্ষে মগ্ধ অস্পৃশ্য বস্তু ছিল বলিয়াই নীচজাতীয় হাড়ি আনাইয়া তাহা দ্বারা মগ্ধভাণ্ড দূর করান হইল এবং অপবিত্র মগ্ধভাণ্ডের স্পর্শ জবা-হরিদ্রাদি অগ্ন্যাগ্ন উপকরণও অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হইয়াছিল বলিয়াই সে সমস্তও হাড়ি দ্বারা দূর করান হইল । আর মগ্ধস্পর্শে সে স্থানও অপবিত্র হইয়াছিল বলিয়া গোময়জল দিয়া সেই স্থানও পবিত্র করা হইল । মগ্ধভাণ্ড না থাকিলে, কেবল ভবানী-পূজার নৈবেদ্য স্বয়ং শ্রীবাসও দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিতেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তিনি হয়তো স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের ডাকিয়া আনার প্রয়োজনও মনে করিতেন না ।

৪১-৪২ । গোপাল-চাপাল এই ভক্তবিশেষের বিবরণ কল হাতে হাতেই পাইল । যেদিন সে ভবানীর নৈবেদ্য সাজাইয়াছিল, তাহার পরে তিন দিনের মধ্যেই তাহার সর্বদা গলিত-কুষ্ঠ হইল; সমস্ত দেহে গলিত-কুষ্ঠের ক্ষতের মধ্যে অসংখ্য কীট (পোকা); তাহারা কুটকুট করিয়া সর্বদা তাহার দেহস্থ ক্ষতে দংশন করিতে লাগিল; তাহাতে

গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া ।  
 একদিন বোলে কিছু প্রভুরে দেখিয়া—॥ ৪৩  
 গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল ।  
 ভাগিনা ! মুণ্ডি কুষ্ঠব্যাধ্যে হইয়াছোঁ ব্যাকুল ॥ ৪৪  
 লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার ।  
 মুণ্ডি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥ ৪৫  
 এত শুনি মহাপ্রভু হৈলা ক্রোধ মন ।  
 ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্জ্জন বচন—॥ ৪৬

আরে পাপী ভক্তদেবী তোরে না উদ্ধারিমু ।  
 কোটিজন্ম এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু ॥ ৪৭  
 শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন ।  
 কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৪৮  
 পাশণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার ।  
 পাশণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥ ৪৯  
 এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গান্নান ।  
 সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

একদিকে যেমন সর্কাক্ষ হইতে রক্ত-পুঞ্জের ধারা বহিতে লাগিল, অপর দিকে আবার অসহ যন্ত্রণায় গোপাল-চাপাল ছটফট করিতে লাগিল ।

৪২ পর্যায় “জলে অস্তর” স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “জলে বাহাস্তর” পাঠান্তরও আছে ; এই পাঠান্তর অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে হয় । **জলে বাহাস্তর**—শরীরের ভিতর বাহির জ্বালা করে ।

৪৩-৪৫ । কুষ্ঠের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া গোপাল-চাপাল গঙ্গার ঘাটে এক গাছতলায় বসিয়া থাকিত । একদিন মহাপ্রভু গঙ্গান্নানের উপলক্ষে সেই ঘাটে গিয়াছিলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া গোপাল-চাপাল অতি কাতরভাবে বলিল—  
 “গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মামা, তুমি আমার ভাগিনেয় ; বাবা, কুষ্ঠব্যাধিতে আমি যারপরনাই কষ্ট পাইতেছি, যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি ; সমস্ত লোককে উদ্ধার করিবার জন্তই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ । বাবা, দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার কর ।”

৪৬ । সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ দয়া থাকে, গোপাল-চাপালের প্রতিও মহাপ্রভুর তদ্রূপ দয়া ছিল ; এজন্যই তিনি গোপালের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন । এই ক্রোধ দয়ারই বিকাশ ; বাস্তবিক ক্রোধ নহে । দয়া বশতঃ সন্তানের মঙ্গলের জন্তই পিতা ক্রুদ্ধ হন । মহাপ্রভুও পরে শ্রীবাসের দ্বারা গোপালকে কৃপা করিয়াছিলেন ।

৪৭-৪৮ । গোপাল-চাপালের প্রতি কষ্ট হইয়া প্রভু বলিলেন—“রে পাপি, তুই ভক্তদেবী, তোর উদ্ধার নাই, কোটি জন্ম পর্য্যন্ত তোকে এইভাবে কুষ্ঠ-রোগের কীটের দংশন-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—ইহাই ভক্তবিদ্বেষের উপযুক্ত শাস্তি ।” কীড়ায়—কুষ্ঠ-রোগের কীট দ্বারা ।

শ্রীবাসই মদিরা দ্বারা ভবানী-পূজা করিয়াছেন, এই অপবাদ রটাইবার জন্তই তুই (গোপাল-চাপাল) তাঁহার দ্বারে মদিরা দ্বারা ভবানী-পূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছিল । এই অপরাধে তোকে কোটি জন্ম রৌরব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে । **রৌরব**—সর্প হইতেও নিষ্ঠুর এক প্রকার জন্তুকে রুক বলে ; যে নরকে ঐ রুক-নামক জন্তু পাপীকে দংশনাদির দ্বারা কষ্ট দেয়, তাহাকে রৌরব বলে ।

৪৯ । পাশণ্ডীদের দুষ্কর্মের বিষময় ফল লোকের সাক্ষাতে প্রকটিত করিলে তাহা দেখিয়া ভয়ে লোক দুষ্কর্ম হইতে বিরত হইবে—এই উদ্দেশ্যেই ভগবান্ কখনও কখনও পাশণ্ডীদের মধ্যে কাহারও কাহারও জন্ত আদর্শ-শাস্তির ব্যবস্থা করেন । দুষ্কর্মের তীব্র ফল দেখিয়া লোক ভীত হইয়া দুষ্কর্ম হইতে বিরত হইলে তখন তাহাদের মধ্যে ধর্ম-প্রচারের সুবিধা হয়, অজ্ঞাত এবং পূর্বজন্মকৃত দুষ্কর্মের শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্তও লোকে ধর্ম্মাচরণে ইচ্ছুক হইতে পারে ।

৫০ । **না যায় পরাণ**—প্রাণাস্তকর দুঃখ হইলেও দুঃখে গোপাল-চাপালের প্রাণবিয়োগ হয় নাই ;



সম্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা ।  
তথা হইতে যবে কুলিয়াগ্রামেতে আইলা ॥ ৫১  
তবে সেই পাপী লইল প্রভুর শরণ ।  
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞা সত্বরণ ॥ ৫২  
শ্রীবাসপণ্ডিতস্থানে হইয়াছে অপরাধ ।  
তাহাঁ যাহ, তেঁহ যদি করেন প্রসাদ ॥ ৫৩  
তবে তোর হবে এই পাপবিমোচন ।  
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥ ৫৪  
তবে বিপ্র লৈল আসি শ্রীবাস শরণ ।

তাঁর কৃপায় পাপ তার হৈল বিমোচন ॥ ৫৫  
আর এক বিপ্র আইল কীর্তন দেখিতে ।  
দ্বারে কবাট, না পাইল ভিতরে যাইতে ॥ ৫৬  
ফিরি গেলা যর বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা ।  
আর দিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞা ॥ ৫৭  
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ ।  
পৈতা ছিড়িয়া শাপে প্রচণ্ড দুঃখ— ॥ ৫৮  
সংসারস্থখ তোমার হউক বিনাশ ।  
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

কারণ, প্রাণবিরোগ হইলেই দুঃখের অবসান হয়, পাপের শাস্তি আর ভোগ করা হয় না ; তাই ভগবান্ তাহার মৃত্যু ঘটান নাই ।

৫১-৫২ । সম্যাসের পূর্বে প্রভু গোপাল-চাপালকে কৃপা করেন নাই ; সম্যাসের পরে তিনি নীলাচলে যান ; নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে জননী ও জাহ্নবীকে দর্শন করিবার উদ্দেশে প্রভু যখন গোড়দেশে আসিয়া ছিলেন, তখন তিনি—গঙ্গার যে পাড়ে নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহার বিপরীত পাড়ে কুলিয়া-গ্রামে আসিয়াছিলেন ; তখন কুলিয়াগ্রামেই গোপাল-চাপাল আবার প্রভুর শরণাপন্ন হয় ; তখন প্রভু কৃপা করিয়া তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দেন । **কুলিয়া**—নবদ্বীপের সম্মুখে গঙ্গার অপর পাড়ে কুলিয়া নামে গ্রাম ছিল ; এখন তাহা গঙ্গাগর্ভে লোপ পাইয়াছে ।

৫৩-৫৪ । প্রভু কৃপা করিয়া গোপাল-চাপালকে বলিলেন—“শ্রীবাস-পণ্ডিতের নিকটে তোমার অপরাধ হইয়াছে ; তাহার নিকটে যাও, তাহার শরণ লও ; তিনি যদি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, আর যদি তুমি ভবিষ্যতে কখনও কোনও তত্ত্বের প্রতি কোনওরূপ বিদ্বেষ-ভাব পোষণ না কর, তাহা হইলে তোমার পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, তুমি রোগমুক্ত হইবে ।”

**শ্রীবাস পণ্ডিতস্থানে** ইত্যাদি—শ্রীবাসের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিয়া তাঁহার দ্বারে মন্ত্ৰভাণ্ড সহ ভবানীপূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখায় তাঁহার চরণে গোপাল-চাপালের অপরাধ হইয়াছে । তত্ত্ব-বিদ্বেষই অপরাধের হেতু । **প্রসাদ**—অনুগ্রহ । **এই পাপবিমোচন**—যে তত্ত্ববিদ্বেষ-জনিত পাপের ফলে তোমার দেহে গলিত-কুষ্ঠ হইয়াছে, সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি । **পুনঃ যদি** ইত্যাদি—কেবল শ্রীবাস প্রসন্ন হইলেই তোমার নিস্তার নাই, শ্রীবাসের প্রসন্নতা যেমন অপরিহার্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে তোমারও তত্ত্ববিদ্বেষ পরিহার করা প্রয়োজন ; নচেৎ তোমার উদ্ধার নাই ।

৫৫ । **তবে**—প্রভুর উপদেশ শুনিয়া । **বিপ্র**—গোপাল-চাপাল । **শ্রীবাস-শরণ**—শ্রীবাসের চরণে আশ্রয় । **তাঁর-কৃপায়**—শ্রীবাসের কৃপায় ।

৫৬-৫৯ । গোপাল-চাপালের বিবরণ বলিয়া আর এক বিপ্রের কথা বলিতেছেন । ইনিও কীর্তন দেখিবার নিমিত্ত শ্রীবাসের অঙ্গনে যাইতেছিলেন ; কিন্তু কপাট বন্ধ বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন । পরে এক-দিন গঙ্গার ঘাটে প্রভুকে দেখিয়া বলিলেন—“নিমাই, তোমারা কপাট বন্ধ করিয়া কীর্তন কর, আমি ঢুকিতে না পারিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি ; আমার মনের দুঃখ এখনও যায়

প্রভুর শাপবার্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্ ।  
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ ৬০  
মুকুন্দদত্তে কৈল দণ্ডপরসাদ ।  
খণ্ডিল তাহার চিন্তের সব অবসাদ ॥ ৬১  
আচার্য্যগোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি ।

তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥ ৬২  
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান ।  
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজান ॥ ৬৩  
তবে আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল ।  
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-ভরসিখী টীকা ।

নাই ; সেই দুঃখে আমি তোমাকে আজ অভিসম্পাত করিব ।” ইহা বলিয়া সেই উগ্রস্বভাব দুর্গুণ ব্রাহ্মণ নিজের পৈতা ছিঁড়িয়া এই বলিয়া প্রভুকে শাপ দিলেন যে—“তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হউক ।”

**শাপিব**—শাপ দিব । **ছিঁড়িয়া**—ছিঁড়িয়া । **শাপে**—শাপ দেয় । **প্রচণ্ড**—উগ্রস্বভাব ; ক্রুদ্ধস্বভাব । **দুর্গুণ**—যাহার মুখ খারাপ ; যে লোককে ক্রুদ্ধ কথা বলে । **সংসার-সুখ**—গৃহস্থাশ্রমের সুখ । “সংসার-সুখ তোমার” ইত্যাদিই প্রভুর প্রতি বিপ্রেীর অভিসম্পাত । **উল্লাস**—আনন্দ ।

বিপ্রেীর শাপ শুনিয়া প্রভুর চিন্তে অত্যন্ত আনন্দ হইল । প্রভুর সংসার-সুখ নষ্ট হওয়ার জন্ত বিপ্র শাপ দিয়াছিলেন । সংসার-সুখ নষ্ট হওয়ার একাধিক অর্থ থাকিতে পারে । কাহারও হয়তো সংসার-সুখ-ভোগের বলবতী বাসনা আছে ; কিন্তু তাহার অর্থবিস্ত সমস্ত নষ্ট হইয়া গেলে, উপার্জনের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেলে, জীপুত্রাদি রোগে অসমর্থ হইয়া গেলে বা মরিয়া গেলে—তাহার আর সংসার-সুখ-ভোগের সম্ভাবনা থাকে না ; এইরূপ লোকের এই ভাবে সংসার-সুখ নষ্ট হইলে তাহার উল্লাস হইতে পারে না, অবর্ণনীয় দুঃখই উপস্থিত হয় । বিপ্রেীর অভিসম্পাতে প্রভুর যখন উল্লাস হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, সংসার-সুখ-ভোগের জন্ত প্রভুর বলবতী বাসনা ছিল না এবং পূর্বোক্তরূপে সংসার-সুখের বিনাশও তিনি আশঙ্কা করেন নাই । আবার কেহ এমন আছেন, কোনও রকমে সংসার হইতে ছুটি পাইতে পারিলে, অথবা কোনও উপায়ে সংসার-সুখের বাসনা দূর করিতে পারিলে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভজন করিতে পারিলেই যিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন । এরূপ লোক যখন ভজনের উদ্দেশ্যে সংসারকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যান, তখনও সাধারণ লোক মনে করে যে, তাহার সংসার-সুখ নষ্ট হইয়াছে । বিপ্রেীর অভিসম্পাতের কথা শুনিয়া প্রভু সম্ভবতঃ এই জাতীয় সংসার-সুখ-নাশের কথাই মনে করিয়াছিলেন (সংসার-ভোগে বাহাদের তীব্র বাসনা নাই, ভগবদ্ভজনের জন্তই যাহারা উন্মুখ, সংসার-সুখ-নাশের এই জাতীয় ধারণাই তাহাদের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক) । বিপ্র যখন প্রভুকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব হইতেই (লৌকিক-লীলাধুরোধে) প্রভু ভগবদ্ভজনে অত্যন্ত উন্মুখ হইয়াছিলেন, তাই সর্বদা কীর্তনাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন । বিপ্রেীর অভিসম্পাত শুনিয়া তিনি মনে করিলেন—“বিপ্রেীর শাপে যদি সংসার-সুখ আমা-হইতে দূরে সরিয়া যায়, আমার চিন্তকে আর আরুণ্ট না করে, তাহা হইলে তো আমার পরম-সৌভাগ্য, আমি নিশ্চিত মনে একান্ত ভাবে ভগবদ্ভজন করিতে পারিব ।”—ইহা ভাবিয়াই প্রভুর উল্লাস হইয়াছিল ।

৬০। **প্রভুর শাপবার্তা**—প্রভুর প্রতি বিপ্রেীর শাপের কথা । **যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্**—শ্রদ্ধাবান্ হইয়া (শ্রদ্ধার সহিত) যিনি শুনে । **ব্রহ্মশাপ**—ব্রাহ্মণের প্রদত্ত অভিসম্পাত । **পরিত্রাণ**—মুক্তি ।

৬১। **দণ্ড-পরসাদ**—দণ্ড-প্রসাদ ; দণ্ডরূপ অল্পগ্রহ । **অবসাদ**—শ্রান্তি । মুকুন্দদত্তের প্রতি প্রভুর দণ্ডের কথা ১১২১৩২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য ।

৬২-৬৪। **আচার্য্য গোসাঞি**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য । **গুরুভক্তি**—গুরুর ছায় শ্রদ্ধা । শ্রীমদ্বৈতআচার্য্য ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী-গোস্বামীর শিষ্য, সুতরাং মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সতীর্থ—গুরু-ভ্রাতা ; তাই প্রভু তাঁহাকে গুরুর ছায় সম্মান করিতেন । **তাহাতে**—প্রভু তাঁহাকে গুরুর ছায় সম্মান করিতেন

মুরারিগুপ্ত মুখে শুনি রামগুণগ্রাম ।

ললাটে লিখিল তার 'রামদাস' নাম ॥ ৬৫

শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জল পান ।

সমস্ত ভক্তের দিল ইষ্টবরদান ॥ ৬৬

হরিদাসঠাকুরেরে করিল প্রসাদ ।

আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥ ৬৭

- গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বলিয়া । **দুঃখমতি**—দুঃখিত ; মহাপ্রভু তাঁহাকে অমুগত ভূত্য মনে করিয়া কৃপা করন, ইহাই ছিল আচার্য্যের অভিপ্রায় ; কিন্তু তাহা না করিয়া প্রভু তাঁহাকে গুরুর আয় সম্মান করিতেন বলিয়া আচার্য্যের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইত । **ভক্তীকরি** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত মনে করিলেন—“প্রভু অস্তুতঃ মনে মনেও যদি আমাকে ভূত্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে কোনও গুরুতর অত্যাচার কাজ করিলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে শাস্তি দিবেন । এইরূপ শাস্তির ব্যপদেশেও যদি বুঝিতে পারি যে, আমার প্রতি প্রভুর ভূত্যবৎ বাৎসল্য আছে, তাহা হইলেও আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করিব ।” এইরূপ ভাবিয়া প্রভুর ক্রোধ-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈত স্বীয় শিষ্যদের নিকটে যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞান-মার্গের প্রাধিক্স স্থাপন করিতে লাগিলেন । অল্প সমস্ত সাধন-মার্গের উপরে ভক্তির প্রাধিক্স স্থাপন করিয়া ভক্তিবিশ্ব প্রচারের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতেরই আস্থানে প্রভুর অবতার ; এই ভক্তি-প্রচারে শ্রীঅদ্বৈতই প্রভুর একজন প্রধান সহায় । এইরূপ অবস্থায় স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতই যদি ভক্তির উপরে জ্ঞানের প্রাধিক্স স্থাপন করিয়া যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে প্রভু যে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? বস্তুতঃ আচার্য্যের ব্যাখ্যার কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং ক্রোধাবেশে শাস্তিপুরে বাইয়া আচার্য্যকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়াছিলেন । শাস্তির বিবরণ আদিলীলার দ্বাদশ-পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য । **অবজান**—অবজ্ঞা ; শাস্তি । **তবে আচার্য্য গোসাঞির** ইত্যাদি—প্রভুর হাতে অভিলষিত দণ্ড পাইয়া আচার্য্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । **লজ্জিত হইয়া** ইত্যাদি—প্রভুও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আচার্য্যের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন । প্রভুর লজ্জার কারণ এই যে, বয়োবৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যকে তিনি যথেষ্ট কিলাইয়াছিলেন—কিলাইতে কিলাইতে মাটিতে শোয়াইয়া ফেলিয়াছিলেন ; তাহা দেখিয়া অদ্বৈত-গৃহিণী শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন । প্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হইলে তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার এই কঠোর শাস্তিতেও শ্রীঅদ্বৈত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন নাই, বরং আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, তখন প্রভুর লজ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক । লজ্জিত হইয়া প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে একটা বর দিলেন ; তাহা এই :—“তিলান্ধেকো যে তোমার করিবে আশ্রয় । সে কেনে পতঙ্গ কীট পশুপক্ষী নয় ॥ যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ । তথাপি তাহারে মুঞি করিমু প্রসাদ ॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য । ১৯ ।” ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি প্রভুর প্রসন্নতার পরিচায়ক ।

৬৫ । **রাম গুণগ্রাম**—শ্রীরামচন্দ্রের গুণসমূহ ( মহিমা ) । **ললাটে**—কপালে । **রামদাস**—শ্রীরামচন্দ্রের দাস ; শ্বেষে শ্রীহুমান । শ্রীমুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত । পূর্বলীলায় তিনি ছিলেন হুমান ( গৌর-গণোদ্দেশ্য । ৯১ ) ।

৬৬ । **শ্রীধরের**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অমুগত খোলাবেচা-ভক্ত শ্রীধরের । **লৌহপাত্রে**—লৌহনির্মিত ঘটতে । **দিল ইষ্ট বর দান**—শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময়ে ভক্তগণকে প্রভু অভীষ্ট বর দান করিয়াছিলেন ।

কীৰ্ত্তন লইয়া প্রভু তাঁহার পরমভক্ত খোলাবেচা দরিদ্র শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়া দেখেন, উঠানে একটা ভাঙ্গা লোহার ঘট পড়িয়া আছে ; প্রভু ঐ ঘটতে করিয়া তখন জলপান করিয়াছিলেন ।

৬৭ । **হরিদাস ঠাকুরের** ইত্যাদি—মহাপ্রকাশের সময় প্রভু ডাকিয়া বলিলেন—“হরিদাস, আমাকে

ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল ।

শুনি এক পঢ়ুয়া তাহা 'অর্থবাদ' কৈল ॥ ৬৮

নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ ।

সভে নিষেধিল—ইহার না দেখিহ মুখ ॥—৬৯

সগণে সচলে যাঞা কৈল গঙ্গাস্নান ।

ভক্তির মহিমা তাহাঁ করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭০

গোর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

দেখ । আমার দেহ হইতে তুমি বড় । যখনগণ যখন তোমাকে বেত্রাঘাতে দুঃখ দিতেছিল, তখন তাদের সকলকে সংহার করিবার উদ্দেশ্যে চক্রহস্তে আমি বৈকুণ্ঠ হইতে নাগিয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি তাহাদের মঙ্গলচিন্তা করিতেছিলে বলিয়া তাদের সংহার করিতে পারি নাই ; তখন আমিই তোমার পৃষ্ঠে পতিত হইয়া প্রহার সহ করিয়াছি ; এখনও অঙ্গে চিহ্ন আছে । হরিদাস, তোমার দুঃখ সহ করিতে না পারিয়াই আমাকে শীঘ্র অবতীর্ণ হইতে হইল ।” প্রভুর করুণার কথা শুনিয়া হরিদাস মুচ্ছিত হইলেন, পরে প্রভুর কথায় বাহু প্রাপ্ত হইলে প্রভুর গুণ স্বরণ করিয়া জন্মন করিতে লাগিলেন এবং নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন । শেষে প্রভুর চরণে তিনি প্রার্থনা করিলেন, যেন জন্মে জন্মে তিনি প্রভুর ভক্তের উচ্ছিষ্ট-ভাজন হইতে পারেন ; “শচীর নন্দন বাপ ! কৃপা কর মোরে । কুকুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে ॥” প্রভু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—“হরিদাস ! তিলান্নেকও তুমি যার সঙ্গে কথা বল, যে এক দিনও তোমার সঙ্গে বাস করে, সে ব্যক্তি নিশ্চই আমাকে পাইবে ।” আরও প্রভু বলিলেন—“মোর স্থানে মোর সর্ব বৈষ্ণবের স্থানে । বিনি অপরাধে তোরে ভক্তি দিল দানে ॥” “হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখনে । জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখনে ॥” শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য । ১০ ॥

আচার্য্য-স্থানে—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে । মাতার—শ্রীশচীমাতার ।

শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকে পরম-ভাগবত জানিয়া মহাপ্রভুর বড়তাই বিশ্বরূপ সর্বদাই তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করিতেন । পরে বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন শচীমাতা মনে করিলেন যে, অদ্বৈতই বিশ্বরূপকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং অদ্বৈতের কথাতেই বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন । ইহার পরে নিমাইও যখন অদ্বৈতের নিকটে একটু যেন বেশী রকম আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন, তখন শচীমাতা মনে করিলেন যে, অদ্বৈত নিমাইকেও বিশ্বরূপের ছায় সংসার ত্যাগ করাইবেন । এইরূপ ভাবিয়া শচীমাতা মনে মনে শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন । ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে শচীমাতার অপরাধ । মহাপ্রকাশের দিন এই অপরাধের জন্ত তিনি শচীমাতাকে প্রেম দান করিলেন না ; এবং বলিলেন, যদি শচীমাতা শ্রীঅদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অপরাধ খণ্ডন হইবে এবং তখন তিনি প্রেমলাভ করিতে পারিবেন । শচীমাতা পদধূলি গ্রহণ করিতে গেলেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত যশোদা-তুল্যা শচীমাতাকে পদধূলি দিতে কিছুতেই সন্মত হইলেন না । শচীমাতার তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে তিনি যখন আবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে শচীমাতা পদধূলি গ্রহণ করিলেন । এইরূপে তাঁহার অপরাধ খণ্ডন হওয়ায় তৎক্ষণেই তাঁহার শরীরে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল । শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ২২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

৬৮ । পঢ়ুয়া—ছাত্র । অর্থবাদ—অতিরঞ্জিত প্রশংসাবাক্য । “হরিনামের যে মহিমার কথা বলা হইল, তাহা অতিরঞ্জিত প্রশংসামাত্র—প্রকৃত পক্ষে হরিনামের এত মহিমা থাকিতে পারে না”—এইরূপ উক্তিকে অর্থবাদ বলে । হরিনামে অর্থবাদকল্পনা একটা নামাপরাধ । কৈল—কহিল ।

একদিন ভক্তগণের নিকটে প্রভু শ্রীহরিনামের মহিমা বর্ণন করিলেন ; সে স্থানে এক পঢ়ুয়া ছিল ; সেও প্রভুর মুখে নামের মহিমা শুনিল ; শুনিয়া বলিল—“নামের এত মহিমা থাকিতে পারে না ; ইনি যাহা বলিলেন, তাহা অর্থবাদ—অতিরঞ্জিত প্রশংসা মাত্র ।”

৬৯-৭০ । নামে স্তুতিবাদ—হরিনামে অর্থবাদ ; নাম-মাহাত্ম্যকে অতিরঞ্জিত স্তুতিবাক্য মাত্র



জ্ঞান কৰ্ম যোগ ধৰ্মে নহে কৃষ্ণ বশ ।

কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥ ৭১

তথাহি—ভাঃ—১১।১৪।২০

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধৰ্ম উক্তব ।

ন স্বাধ্যায়ন্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তিৰ্মমোজ্জিতা ॥ ৫

মোকের সংস্কৃত টীকা ।

ন সাধয়তীতি । মৎসাধনার্থং প্রযুক্তোহপি যোগাদিস্তথা মাং ন সাধয়তি বরায়োনুৎকং করোতি । যথা উজ্জিতা ভক্তিঃ সাধনাত্মিকা । শ্রীজীব ৫ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

মনে করার কথা । **সন্তে নিবেধিল**—প্রভু সকল ভক্তকে নিবেধ করিলেন । **ইহার না দেখিহ মুখ**—নাম-মাহাশ্যে অর্থবাদ-কল্পনাকারী এই পটুয়ার মুখ দর্শন করিওনা । **সগণে**—গণের ( সঙ্গীয়-লোক সকলের ) সহিত । **সচেলে**—চেলের ( পরিহিত বস্ত্রের ) সহিত ; সবস্ত্রে । **তাই**—সেই স্থানে ; গঙ্গাস্নানের স্থানে ।

পটুয়ার মুখে নাম-মাহাশ্যে অর্থবাদ-কল্পনার কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ; সকলকে বলিয়া দিলেন, কেহ যেন ঐ নামাপরাধী পটুয়ার মুখদর্শন না করে । তারপর নামাপরাধী পটুয়ার মুখদর্শনে দেহ অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া সঙ্গীয় সমস্ত লোকের সহিত প্রভু সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করিলেন এবং গঙ্গাস্নান করিতে করিতে তাঁহাদের নিকটে তিনি ভক্তির মহিমা বর্ণনা করিলেন ।

নাম-মাহাশ্যে অর্থবাদ-কল্পনায় যে অপরাধ হয়, তাহার গুরুত্ব-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রভু নামাপরাধীর মুখদর্শন নিবেধ করিলেন এবং নামাপরাধীর দর্শনে সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হওয়ার ব্যবস্থা করিলেন ।

৭১। **জ্ঞানকর্ম যোগধর্ম**—জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, বা যোগমার্গের সাধনে । **কৃষ্ণবশ-হেতু**—কৃষ্ণকে বশীভূত করার এক মাত্র হেতু । **প্রেমভক্তিরস**—প্রেমভক্তিরূপ রস । বিভাব-অনুভাবাদি-সামগ্রীর মিলনে প্রেমলক্ষণা-ভক্তি রসে পরিণত হয় ( ভূমিকার ভক্তিরস-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ) । “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ মাঠর ক্রতিঃ ॥”

শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর ; ভক্তের প্রেমরস-নির্ঘাস আশ্বাদনের নিমিত্তই তিনি লালায়িত এবং সেই সেই প্রেমরস নির্ঘাসদ্বারাই তাঁহাকে বশীভূত করা যায় ; ভক্তিমাৰ্গই সেই শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-যোগ্য প্রেমভক্তি লাভ করিবার একমাত্র সাধন ; জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ বা যোগমার্গে সেই প্রেমভক্তিও লাভ করা যায় না, স্ততরাং শ্রীকৃষ্ণকেও বশীভূত করা যায় না । শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করার উদ্দেশ্য—নিজের ইচ্ছানুরূপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতিসম্পাদন মাত্র ।

এই পয়ার—ভক্তির মহিমা-ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে ভক্তগণের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি । এই পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে “ন সাধয়তি”-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

কোনও কোনও গ্রন্থে “প্রেমভক্তিরস”-স্থলে “নাম-প্রেমরস”-পাঠ দৃষ্ট হয় । নাম-প্রেমরস—নাম ( শ্রীহরিনাম-কীর্তন ) ও প্রেমরস ; নামকীর্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে প্রেমভক্তি লাভ হয়, বিভাব-অনুভাবাদির সম্মিলনে রসরূপে পরিণত সেই প্রেমভক্তি ।

শ্লো । ৫ । **অর্থ** । উক্তব ( হে উক্তব ) ! মম ( আমার ) উজ্জিতা ( দৃঢ় ) ভক্তিঃ ( ভক্তি ) মাং ( আমাকে ) যথা ( যেরূপ ) সাধয়তি ( সাধন করে—বশীভূত করে ) তথা ( সেইরূপ—বশীভূত করিতে ) ন যোগঃ ( যোগ পারে না ) ন সাংখ্যঃ ( সাংখ্য পারে না ) ন ধর্মঃ ( ধর্ম পারে না ) ন স্বাধ্যায়ঃ ( বেদাধ্যায়ন পারে না ), ন তপঃ ( তপস্তা পারে না ) ন ত্যাগঃ ( ত্যাগ—সন্ন্যাস—পারে না ) ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“হে উক্তব ! মদ্বিষয়ক দৃঢ়ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে—যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদাধ্যায়ন, তপস্তা এবং সন্ন্যাসও সেইরূপ পারে না ।” ৫ ।

মুরারিকে কহে—তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা ।

শুনিয়া মুরারি শ্লোক পড়িতে লাগিল ॥ ৭২

তথাহি তত্রৈব ( ১০।৮।১৬ )—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।

ব্রহ্মবন্ধুরিতি শ্বাহং বাহুভ্যাং পরিরস্তিতঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

কেতি । পাপীয়ান্ দুর্ভগঃ কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎভগবান্ । এবং কৃষ্ণ-পাপীয়স্বয়ো দারিদ্র্য-শ্রীনিকেতনদ্বারা বিরোধঃ । তথাপি ব্রহ্মবন্ধুঃ বিপ্রকুলজাত ইতি বাহুভ্যাং দ্বাভ্যাং পরিরস্তিতঃ পরিরুদ্ধঃ । অ নিশ্চয়ে । এবং পরিরস্তে বিপ্রকুলেন কারণকৃষ্ণং নতু সখ্যং তত্রান্নানোহতীনাযোগ্যত্বমননাৎ । অতো ভগবতো ব্রহ্মণ্যেতৈব শ্লাঘিতা, ন তু ভক্তবৎসলতাপীতি ন কেবল পরিরুদ্ধ এব । শ্রীসনাতন । ৬ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

**উজ্জিতা**—জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত বিজ্ঞান ও দৃঢ়তা । **যোগঃ**—অষ্টাঙ্গ যোগ । **সাংখ্য**—সাংখ্যযোগ । **ধর্ম**—স্বধর্ম, বর্ণাশ্রম-ধর্ম, কর্মমার্গ । **স্বাধ্যায়ঃ**—বেদাধ্যয়ন । **তপঃ**—তপস্বী, কচ্ছসাধন । **ত্যাগঃ**—সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাস । **মাং-সাধয়তি**—আমাকে সাধন করে ; আমাকে বশীভূত করে ।

যোগ-কর্মাদি অষ্টাঙ্গ সাধনমার্গ-অপেক্ষা ভক্তি-মার্গই শ্রেষ্ঠ ; কারণ, এক মাত্র ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে সম্যকরূপে সাধকের বশীভূত করিতে সমর্থ ; যোগ-কর্মাদি সম্যক বশীকরণে সমর্থ নহে—ইহাই এই শ্লোকে দেখান হইল । পূর্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ।

৭২ । **মুরারিকে**—মুরারিগুণ্ডকে । **কহে**—প্রভু কহেন । **শ্লোক**—নিম্নে উদ্ধৃত “কাহং”—ইত্যাদি শ্লোক ; দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীদাম-বিপ্রকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীদাম এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন ( নিম্নলিখিত শ্লোকের টীকার-শেষাংশ দ্রষ্টব্য ) ।

**শ্লো। ৬ । অম্বয় ।** দরিদ্রঃ ( দরিদ্র—গরীব ) পাপীয়ান্ ( পাপী ) অহং ( আমি ) ক ( কোথায় ), শ্রীনিকেতনঃ ( লক্ষীর আবাসস্থল ) কৃষ্ণঃ ( শ্রীকৃষ্ণ ) ক ( কোথায় ) ? ব্রহ্মবন্ধুঃ ( ব্রহ্মবন্ধু—আনি ) ইতি ( তাই ) অ ( অহো ) অহং ( আমি ) বাহুভ্যাং ( কৃষ্ণের বাহুদ্বয় দ্বারা ) পরিরস্তিতঃ ( আলিঙ্গিত ) ।

**অনুবাদ ।** শ্রীদাম-বিপ্র কহিলেন—“অহো ! কোথায় আমি লক্ষীবিহীন দরিদ্র পাপী, আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ ! আমি ব্রহ্মবন্ধু বলিয়াই তিনি বাহুদ্বারা আমার আলিঙ্গন করিলেন । ৬ ।”

শ্রীদাম-বিপ্র বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন ; উভয়ে এক সঙ্গে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, এক সঙ্গে খেলাধলা করিয়াছেন ; উভয়ের মধ্যে খুব প্রীতি ছিল । পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় অধিপতি হইয়াছেন, তখন শ্রীদাম এত দরিদ্র যে, ভিক্ষা করিয়া দিনান্তেও একবার নিজে খাইতে পারেন না, নিজের পরিবারকেও খাওয়াইতে পারেন না । অভাবের তাড়না আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পত্নী একদিন তাঁহাকে বলিলেন—“শ্রীকৃষ্ণ তো তোমার বাল্যবন্ধু ; তিনি এখন দ্বারকার রাজা ; তুমি যদি একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, তাহা হইলে তোমার কিছু উপকার হইতে পারে ।” পত্নীর কথায় কম্পিত-হৃদয়ে শ্রীদাম দ্বারকায় চলিলেন । বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন, অনেক দিন পরে ; বন্ধুর জ্ঞাত কি উপহার লইয়া যাইবেন ? ঘরেও কিছুই নাই ; ব্রাহ্মণী প্রতিবেশীর গৃহ হইতে চারি মুষ্টি চিড়া আনিয়া দিলেন ; বিপ্র তাহাই কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া চলিলেন । দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া রাজপুরীর ঐশ্বর্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন ; সন্ধ্যা চিড়ার পুটুলি বগলে লুকাইলেন । কম্পিত-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন মণিকাঞ্চন-খচিত বহুমূল্য পর্যাঙ্কে রুক্মিণী-দেবীর গৃহে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন । শ্রীদামকে দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়া আসিয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পর্যাঙ্কে বসাইয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন ; রুক্মিণী-দেবী তাঁহাকে চাগর ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন । অন্তর্গামী শ্রীকৃষ্ণ চিড়ার পুটুলির কথাও জানিতে পারিয়াছেন ; তাই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

তিনি বলিলেন—“সখা, আমার জন্ম কি আনিয়াছ দাও ।” শ্রীদাম তো লজ্জায় সন্মোচে একেবারে জড়সড় ; এত ঐশ্বর্য যার, স্বয়ং লক্ষ্মী যার পাদ-সেবা করিতেছেন, ভারতের সমস্ত রাজ্যবর্গ যার কৃপা-কটাক্ষের জন্ম লাভায়িত, তাঁহার হাতে এক মুষ্টি চিড়া শ্রীদাম কিরূপে দিবেন ? তিনি চিড়া বাহির করেন না—বরং বগল আরও চাপিয়া ধরেন । কৌতুকী-শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রের বগল হইতে জোর করিয়া চিড়ার গুটুলি বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন—ভক্তের প্রীতির বস্তু তিনি আশ্বাদন না করিয়া কি থাকিতে পারেন ? শ্রীদামের এক মুষ্টি চিপটকের সহিত যে প্রীতি মিশ্রিত হইয়া আছে, তাহার তুলনায় সমগ্র পৃথিবীর রাজ্যশ্রুতিও যে নিতান্ত তুচ্ছ !

যাহা হউক, শ্রীদামের প্রীতির বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার চিড়া খাইলেন । এখন, প্রীতির স্বভাবই এই—যাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি যত বেশী দিকশিত হয়, নিজের দৈছ—নিজের হেয়তা-জ্ঞান—তাঁহার তত বেশী হয়, তিনি নিজেকে তত বেশী অযোগ্য বলিয়া মনে করেন । শ্রীদামেরও তাহাই হইল ; তাই শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে তিনি বিম্মিত হইলেন ; তিনি মনে মনে ভাবিলেন—“কি আশ্চর্য ! আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য, লক্ষ্মীর কৃপার ছায়াও আমাকে স্পর্শ করে নাই ; তাই আমি এত দরিদ্র যে, দিনান্তেও একবার মুখে এক মুষ্টি অন্ন দিতে পারি না । আর এই শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার পাদসেবা করেন, তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিলাস করেন । তাঁহার সঙ্গে আমার তুলনা ! আমি মহাপাপী, কত জন্ম-জন্মান্তরের পাপ আমার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে ; আমার ছুরবহাই তাহার প্রমাণ । আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ !! কোথায় আমি, আর কোথায় তিনি !! তথাপি তিনি যে আনায় আলিঙ্গন করিলেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষয় । তবে ইহার একটা কারণ বোধ হয় আছে ; শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেব, আর—আমি ব্রাহ্মণ-বংশের কলঙ্ক—ব্রহ্মবধু—হইলেও ব্রাহ্মণ-বংশেই আমার জন্ম ; তাই ব্রাহ্মণ-বংশের মর্যাদারক্ষার্থই বোধ হয়, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন ।”

বস্তুতঃ ভক্ত-বৎসলতা-গুণের বশীভূত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম-ভক্ত শ্রীদামকে আলিঙ্গন করিয়াছেন ; শ্রীদামের কিন্তু ভক্ত-অভিমান ছিল না বলিয়া দৈছবশতঃ—শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-বাৎসল্যকে আলিঙ্গনের হেতু মনে না করিয়া তাঁহার ব্রহ্মণ্যতাকেই হেতু মনে করিয়াছেন ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদামবিপ্রের নাম নাই । আছে কেবল “কশিচ্চ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিস্তমঃ—ব্রহ্মবিস্তম কোনও এক ব্রাহ্মণ ॥ শ্রীভা, ১০।৮।১৬ ॥” শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮।১ অধ্যায় হইতে জানা যায়, এই ব্রাহ্মণের জন্ম শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়াছিলেন । তদনুসারে অষ্টোত্তরশতনামে শ্রীকৃষ্ণের একটা নামও দৃষ্ট হয়—শ্রীদামব্রহ্ম-ভক্তার্থ-ভূম্যানীতেজ্রবৈভবঃ—(যিনি শ্রীদামনামক ভক্তের জন্ম ভূমিতে—মর্ত্যে—ইন্দ্রের বৈভব আনয়ন করিয়াছিলেন) । ইহা হইতে জানা যায়, যে ব্রহ্মবিস্তম ব্রাহ্মণের জন্ম শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীদাম । শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮।১৬ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—“কশিদ্দেকঃ শ্রীদামনামা, শ্রীদামব্রহ্মভক্তার্থ-ভূম্যানীতেজ্রবৈভবঃ । ইত্যষ্টোত্তরশতনামপাঠাৎ ॥” নারদপঞ্চরাত্রেও শ্রীকৃষ্ণের ঐ নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । শ্রীদামশ্চুভক্তার্থ-ভূম্যানীতেজ্রবৈভবঃ ॥ ৪।৩।১৫৭ ॥

মুরারিগুপ্তকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন বলিলেন “মুরারি, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছ ।”—তখন মুরারি উক্ত শ্লোকটির উচ্চারণ করিয়াছিলেন । ইহার ব্যঞ্জনা এই যে, ভক্তির আধিক্য-জনিত অত্যধিক দৈছবশতঃ শ্রীদামবিপ্র যেমন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনের অযোগ্য মনে করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভক্তিজনিত দৈছবশতঃ মুরারিগুপ্তও নিজেকে শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করিয়াছিলেন ।

**শ্রীনিকেতনঃ**—শ্রীর ( লক্ষ্মীর ) নিকেতন ( আবাস ) ; যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থল, সমগ্র ঐশ্বর্যের অধিপতি ; স্বয়ং ভগবান্ । **ব্রহ্মবধুঃ**—ব্রাহ্মণের মধ্যে অধন ব্যক্তিকে ব্রহ্মবধু বলে ; শ্রীদাম দৈছবশতঃ নিজেকে ব্রহ্মবধু

এক দিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া ।  
সঙ্কীৰ্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥ ৭৩  
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল ।  
তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৭৪  
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত ।  
পাকিল অনেক ফল—সভেই বিস্মিত ॥ ৭৫  
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল ।

প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥ ৭৬  
রক্ত পীত-বর্ণ, নাহি অষ্টাংশ-বক্ষল ।  
একজনের উদর পূরে খাইলে এক ফল ॥ ৭৭  
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল শচীর নন্দন ।  
সভাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥ ৭৮  
অষ্টাংশ-বক্ষল নাহি অমৃতরসময় ।  
একফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

বলিয়াছেন । স্ম—বিশ্বয়-বোধক শব্দ । শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে আলিঙ্গন করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীদাম বিস্মিত হইয়াছিলেন ।  
**পরিব্রজিত :—**আলিঙ্গিত ।

৭৩ । **সঙ্কীৰ্তন করি—**সঙ্কীৰ্তন করিয়া, সঙ্কীৰ্তনের পরে । **বৈসে—**বিশ্রামের জন্ত বসিলেন । **শ্রমযুক্ত—**পরিশ্রান্ত ; কীৰ্তনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ।

৭৩-৭৫ । **আম্রবীজ—**আমের বীজ । **অঙ্গনে—**শ্রীবাস-অঙ্গনে বিশ্রামস্থলে । **তৎক্ষণে—**রোপণ করা মাত্রই । **ফলিত—**ফলযুক্ত ।

সকলের সঙ্গে বসিয়া প্রভু বিশ্বাম করিতেছেন ; এমন সময় সেই অঙ্গনেই প্রভু একটি আমের বীজ রোপণ করিলেন । প্রভু স্বয়ংভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ; তিনি ইচ্ছাময়, যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তখনই তাহা হইতে পারে । তাঁহারই ইচ্ছায়, তাঁহারই অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে আম্রবীজ রোপণ করা মাত্রই তাহা অঙ্কুরিত হইল, দেখিতে দেখিতে অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইল, বৃক্ষ বড় হইল, তাহাতে মুকুল হইল, মুকুল হইতে ফল জন্মিল, ফল বড় হইল—পাকিল ; একটি দুইটি ফল নহে—বহু ফল গাছে পাকিয়া রহিল । দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন । [ প্রকৃত কথা এই যে, শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রীদাম নবদ্বীপেরই অন্তর্গত একটি অপ্রাকৃত চিন্ময় স্থান ; কথিত আম্রবৃক্ষ সে স্থানে নিত্যই বিরাজিত—তবে এ পর্যন্ত অপ্রকট—ছিল । প্রভুর ইচ্ছায় এখন তাহা প্রকটিত হইল এবং প্রকট-কালে ব্রহ্মাওলীলার অল্পকরণে আম্রবৃক্ষেরও জন্মাদি-সমস্ত লীলা যথাক্রমে—অবশ্য বিশ্বাসের অযোগ্য অত্যন্ত সময়ের মধ্যেই—প্রভু প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন । যাহারা ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি মানেন না, লীলার নিত্যত্ব এবং ব্রহ্মাও নিত্য-লীলার প্রাকট্য মানেন না, তাঁহারা অবশ্যই এসকল কথা বিশ্বাস না করিতে পারেন ; কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে বিশ্বাসবান্ লোকের নিকট এসমস্ত অসম্ভব নহে । ]

৭৬-৭৭ । **প্রক্ষালন করি—**ধুইয়া । **রক্ত-পীত-বর্ণ—**আমগুলির কোনটা বা রক্ত ( লাল ) বর্ণ, আবার কোনটা পীত ( হরিদ্রা )-বর্ণ ছিল । **অষ্টাংশ—**অষ্ট ( আট ) + অংশ ( আঁশ ) । **বক্ষল—**বাকল । আমগুলিতে আট তো ছিলই না, আঁশও ছিল না, বাকলও ছিল না । **উদরপূরে—**পেট ভরে । এক একটি আম এত বড় যে, খাইলে একটাতেই একজনের পেট ভরিয়া যায় । আট, আঁশ ও বাকল নাই বলিয়া আমের কোনও অংশই ফেলিতে হইত না, সমস্তই খাওয়া বাইত ।

৭৮ । প্রভু আগে নিজে খাইয়া দেখিলেন ; তার পর সকলকেই সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাসাদী আম খাওয়াইলেন ।

৭৯ । **অমৃত-রসময়—**অমৃতের স্রাব সুস্বাদু রসে পরিপূর্ণ । আমে আট নাই, আঁশ নাই, বাকল নাই ; যাহা আছে, তাহা কেবল অমৃতের স্রাব সুস্বাদু রসে পরিপূর্ণ । ( এই আমও প্রাকৃত আম নহে ; প্রাকৃত আমে আট, আঁশ, বাকল—সবই থাকে ; ইহা অপ্রাকৃত আম ) ।

এইমত প্রতিদিন ফলে, বারমাস ।  
 বৈষ্ণবে খায়েন ফল—প্রভুর উল্লাস ॥ ৮০  
 এই সব লীলা করে শচীর নন্দন ।  
 অগ্নি লোক নাহি জানে—বিনা ভক্তগণ ॥ ৮১  
 এইমত বারমাস কীর্তন-অবসানে ।  
 আত্ম-মহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৮২  
 কীর্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ ।  
 আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘনিবারণ ॥ ৮৩  
 একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল—  
 বৃহৎ সহস্রনাম পঢ়—শুনিতে মন হৈল ॥ ৮৪

পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম ।  
 শুনিত্তা আবিষ্ট হৈল প্রভু গৌরধাম ॥ ৮৫  
 নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া ।  
 পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥ ৮৬  
 নৃসিংহ-আবেশ দেখি মহা তেজোময় ।  
 পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয় ॥ ৮৭  
 লোকভয় দেখি প্রভুর বাহু হইল ।  
 শ্রীবাসের গৃহে যাঞা গদা ফেলাইল ॥ ৮৮  
 শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিবাদ ।  
 লোক ভয় পাইল, মোর হৈল অপরাধ ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

৮০-৮১ ।—ঐ গাছটীতে বারমাস ধরিয়া—সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়াই—প্রত্যহ একরূপ আম ধরিত ; প্রত্যহই ঐ ভাবে কীর্তনান্তে প্রভু ও ভক্তগণ ঐ ভাবে আম খাইতেন । কিন্তু ভক্তগণ ব্যতীত অগ্নি কেহ ঐ আম গাছও দেখিত না, আমও দেখিত না, সকলের আম খাওয়ার কথাও জানিত না । [ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে ভক্তদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়া যায় ; তাই তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবদ্ধামের সমস্ত লীলাই দর্শন করিতে পারেন । অগ্নি লোক প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা সে সমস্ত কিছুই দেখিতে পায় না । ]

৮২ । বারমাস—সর্বদা ; প্রত্যহ । কীর্তনাবসানে—কীর্তনের পরে । আত্ম-মহোৎসব করে—উক্ত অপ্রাকৃত আম্রবৃক্ষ হইতে আম পাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়া সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিতেন । দিনে দিনে—প্রতিদিন ।

৮৩ । আর এক লীলার কথা বলিতেছেন । একদিন কীর্তনের সময় আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল ; প্রভুর ইচ্ছা মাত্রেই—সমস্ত মেঘ দূরীভূত হইল, এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িল না ।

৮৪-৮৫ । বৃহৎ-সহস্র-নাম—মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহস্রনাম । এই সহস্রনামে নৃসিংহের নাম আছে । আবিষ্ট হইল—শ্রীনৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট হইলেন, প্রভু । প্রভু গৌরধাম—গৌরবর্ণ জ্যোতি যে প্রভুর ; শ্রীগৌরানন্দ-মহাপ্রভু ।

মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহস্রনাম পড়িবার নিমিত্ত প্রভু একদিন শ্রীবাসকে আদেশ করিলেন । প্রভুর আদেশে সহস্রনাম পড়িতে পড়িতে যখন শ্রীবাস নৃসিংহের নাম উচ্চারণ করিলেন, তখনই প্রভু নৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন ।

৮৬ । পাষণ্ডী হিরণ্যকশিপুকে সংহার করার নিমিত্ত শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল ; নৃসিংহদেবের এই পাষণ্ড-সংহার-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু সমস্ত পাষণ্ডীকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে গদা হাতে শ্রীবাস অঙ্গন হইতে বাহির হইয়া নগরের দিকে দৌড়াইয়া গেলেন ।

৮৭ । ভাগে—পলাইয়া যায় । নৃসিংহের আবেশে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ হইতে অদ্ভুত জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল ; তাহা দেখিয়া এবং হাতে গদা দেখিয়া ভয়ে পথের লোক সকল পথ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল ।

৮৮-৮৯ । লোকভয় দেখি—ভয়ে লোক সকল পলাইতেছে দেখিয়া, তাহাদের মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখিয়া । বাহু হৈল—প্রভুর বাহুজ্ঞান হইল, আবেশ ছুটিয়া গেল । ফেলাইল—ফেলিয়া দিলেন । করিয়া বিবাদ—দুঃখ করিয়া । হৈল অপরাধ—অনর্থক ভয় দেখাইয়া লোকসকলকে উদ্বেগ দিয়াছি ; তাতে আমার অপরাধ হইয়াছে ।



শ্রীবাস বোলেন—যে তোমার নাম লয় ।  
তার কোটি অপরাধ সব ক্ষয় হয় ॥ ৯০  
অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার ।  
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥ ৯১  
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন ।  
তুচ্ছ হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন ॥ ৯২  
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায় ।  
প্রভুর অঙ্গনে নাচে—ডমরু বাজায় ॥ ৯৩  
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন ।

তার কান্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বল্লভ ॥ ৯৪  
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে ।  
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিল করিতে ॥ ৯৫  
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে ।  
প্রভু তারে প্রেম দিল—প্রেমরসে ভাসে ॥ ৯৬  
আর দিনে জ্যোতিষ সর্বজ্ঞ এক আইল ।  
তাহার সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল—॥ ৯৭  
কে আছিলিঙ্ক আমি পূর্বজন্মে কহ গণি ? ।  
গণিতে লাগিলা সর্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৯০-৯১ । প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন—“না প্রভু, তোমার কোনও অপরাধ হয় নাই ; যে তোমার নাম গ্রহণ করে, তার কোটি কোটি অপরাধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; তোমার আবার অপরাধ কি ? অপরাধ কর নাই, তুমি লোকের উদ্ধার করিয়াছ ; নৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট অবস্থায় যে তোমার দর্শন পাইয়াছে, তাহারই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে । তুমি পাবগুণী-সংহার করিতে ধাইয়া গিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে ; তোমার দর্শনে পাষণ্ডীর পাষণ্ডিত্ব দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা সাধু হইয়াছে ।”

৯২ । শ্রীনিবাস—শ্রীবাস । পূর্ববর্তী ৩৬ পয়ায়েও শ্রীবাসকে শ্রীনিবাস বলা হইয়াছে । ইনি শ্রীনিবাস-আচার্য্য নহেন ; কারণ, যখনকার কথা বলা হইতেছে, তাহার বহুবৎসর পরে শ্রীনিবাস-আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে ।

৯৩-৯৪ । মহাদেবের ভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবেশের কথা বলিতেছেন । শিবভক্ত—শিবের ভক্ত ; শিবের উপাসক । ডমরু—ডুগডুগি । মহেশ-আবেশ—মহেশের ( শিবের বা মহাদেবের ) আবেশ ।

একদিন একজন শিব-ভক্ত ডমরু বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর অঙ্গনে শিবের মহিমা কীর্ত্তন করিতে ছিলেন ; তাহা শুনিয়া প্রভু মহাদেবের ভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং সেই শিবভক্তের কান্ধে চড়িয়া অনেক ক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন ।

এসময়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত ( মধ্য ৮ম অধ্যায় ) বলেন—“একদিন আসি এক শিবের গায়ন । ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন ॥ আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে । গাইয়ে শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে ॥ শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বস্তর । হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাম্বর ॥ এক লক্ষে উঠি তার স্বক্ষের উপর । হৃদয় করিয়া বোলে ‘মুঞি যে শঙ্কর’ ॥ কেহো দেখে জটা শিখা ডমরু বাজায় । ‘বোল বোল’ মহাপ্রভু বোলরে সদায় ॥ সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল । পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল । সেই সে গাইল শিব নির-অপরাধে । গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈলা যার স্বক্ষে ॥ বাহু পাই নামিলেন প্রভু বিশ্বস্তর । আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর ॥”

৯৫-৯৬ । এক ভিক্ষুককে প্রেমদানের কথা বলিতেছেন । একদিন এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল ; তখন দেখিল যে প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন ; তাহা দেখিয়া ভিক্ষুকও পরম-উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল, প্রভু তাহার নৃত্য দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রেম দান করিলেন ; পরম ভাগ্যবান্ ভিক্ষুক প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাসিয়া যাইতে লাগিল ।

৯৭-৯৮ । এক সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীকে প্রেমদানের কথা বলিতেছেন ৯৭-১০৮ পয়ায়ে । একদিন প্রভুর গৃহে এক জ্যোতিষী আসিয়াছিলেন ; জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি সর্বজ্ঞ ছিলেন ; প্রভু খুব সম্মান করিয়া তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি পূর্বজন্মে কে ছিলাম, গণিয়া বল দেখি ?” শুনিয়া জ্যোতিষী গণিতে লাগিলেন ।

গণি ধ্যানে দেখে সর্বজ্ঞ—মহাজ্যোতির্ময় ।

অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সভার আশ্রয় ॥ ১০৯

পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম-ঈশ্বর ।

দেখি প্রভু-মূর্তি সর্বজ্ঞ হইল ফাঁফর ॥ ১০০

বলিতে না পারে কিছু, মৌন ধরিল ।

প্রভু পুন প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল— ॥ ১০১

পূর্বজন্মে ছিলা তুমি জগত-আশ্রয় ।

পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্বৈশ্বর্যময় ॥ ১০২

পূর্বের যৈছে ছিলা, তুমি, এবে সেইরূপ ।

দুর্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ ॥ ১০৩

প্রভু হাসি বোলে—তুমি কিছু না জানিলা ।

পূর্বের আমি আছিলাঙ্ জাতিয়ে গোয়াল ॥ ১০৪

গোপগৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল ।

সেই পুণ্যে এবে হৈলাঙ্ ব্রাহ্মণ ছাত্তয়াল ॥ ১০৫

সর্বজ্ঞ কহে—তাহা আমি ধ্যানে দেখিলাঙ্ ।

তাহাতেও ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁপর হৈলাঙ্ ॥ ১০৬

সেই রূপে এই-রূপে দেখি একাকার ।

কভু ভেদ দেখি, এই মায়ায়ে তোমার ॥ ১০৭

যে হও সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার ।

প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার ॥ ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

জ্যোতিষ—গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি-আদি এবং লোকের উপরে তাহাদের প্রভাব-আদি যে শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে, তাহাকে জ্যোতিষ-শাস্ত্র বলে । জ্যোতিষসর্বজ্ঞ—জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ ; যিনি সমস্ত জানেন, তাহাকে সর্বজ্ঞ বলে ।

১০৯-১০১ । মহা জ্যোতির্ময়—পরম-জ্যোতিষ্মান্, যাহার দেহ হইতে মহা-উজ্জল অপূর্ণ জ্যোতিঃ-পুঞ্জ বাহির হইতেছে । অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি—অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় । পরতত্ত্ব—শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব । পরব্রহ্ম—বৃহদ্বস্ত ব্রহ্মের চরম বিকাশ । পরম ঈশ্বর—ঈশ্বরত্বের চরম-বিকাশ যাহাতে ; স্বয়ং ভগবান্ । ফাঁফর—কিংকর্তব্যবিমূঢ় । মৌন—নির্বাক ।

প্রভুর আদেশে সর্বজ্ঞ প্রভুর পূর্বজন্মের বিষয় গণনা করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইলেন ; তিনি প্রভুর মূর্তি ধ্যান করিতে করিতে দেখিলেন—“সেই মূর্তি হইতে পরম-উজ্জল অপূর্ণ জ্যোতিঃপুঞ্জ সর্বদিকে নিঃসৃত হইতেছে । আর দেখিলেন—সেই মূর্তিই অনন্ত বৈকুণ্ঠ এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয় । তিনি আরও দেখিলেন—ঐ মূর্তিই পরতত্ত্ব, ঐ মূর্তিতেই ব্রহ্মের চরমবিকাশ এবং তাহাই পূর্ণতম ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্ ।” প্রভুর এই রূপ দেখিয়া সর্বজ্ঞ কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন ; কি বলিবেন, কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া তিনি চূপ করিয়া রহিলেন । তাঁহার অবস্থা দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন ; তখন যেন তাঁহার সংবিৎ ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন ।

১০২-১০৩ । সর্বজ্ঞ বলিলেন—“গণিয়া দেখিলাম, তুমি পূর্বজন্মে অনন্ত বৈকুণ্ঠের এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় বৈষ্ণবময় স্বয়ংভগবান্ ছিলে ; এই জন্মেও তুমি তাহাই ; আর, শ্রীনিত্যানন্দ—তোমারই এক স্বরূপ, তাঁহার তত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়—আমি নির্ণয় করিতে অসমর্থ ।”

দুর্বিজ্ঞেয়—যাহা অবগত হওয়া দুঃসাধ্য ; যাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না ।

১০৪-১০৫ । সর্বজ্ঞের কথা শুনিয়া প্রভু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—“না, আমার পূর্বজন্মের বিবরণ তুমি জানিতে পার নাই । পূর্বজন্মে আমি জাতিতে গোয়াল ছিলাম, গোয়ালার গৃহে আমার জন্ম হইয়াছিল ; তখন আমি গাভী চরাইতাম ; সেই পুণ্যেই এই জন্মে আমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ।” কোতুকী প্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন—“পূর্বের প্রকটলীলায় গোপ-অভিমান লইয়া তিনি শ্রীমদগোপের গৃহে প্রকটিত হইয়াছিলেন ; নন্দগোপের খেচুর রাখাল গোপবেশ-বেণুকর শ্রীকৃষ্ণই তিনি ।”

১০৬-১০৮ । প্রভুর কথা শুনিয়া সর্বজ্ঞ বলিলেন—“তুমি যাহা বলিলে, ধ্যানে আমি তাহাও দেখিয়াছি,—তুমি গোয়ালার ছেলে, খেচু চরাইতেছ । কিন্তু তোমার রাখাল-বেশেও তোমার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমি আবাক

একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ।  
 ‘মধু আন মধু আন’ বোলেন ডাকিয়া ॥ ১০৯  
 নিত্যানন্দ গোসাঁঞির আবেশ জানিল ।  
 গঙ্গাজলপাত্র আনি সম্মুখে ধরিল ॥ ১১০  
 জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল ।  
 যমুনাকর্ষণলীলা দেখয়ে সকল ॥ ১১১  
 মদমত্ত গতি বলদেব-অনুকার ।  
 আচার্য্যশেখর তাঁর দেখে রামাকার ॥ ১১২  
 বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাজল ।

সভে মিলি নৃত্য করে—আবেশে বিহ্বল ॥ ১১৩  
 এইমত নৃত্য হইল চারিপ্রহর ।  
 সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সভে গেলা ঘর ॥ ১১৪  
 নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আভ্রা দিল ।  
 ঘরে ঘরে সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে লাগিল ॥ ১১৫  
 “হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।  
 গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥” ১১৬  
 মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীৰ্ত্তন উচ্চধ্বনি ।  
 হরিহরি-ধ্বনি বিনে আন নাহি শুনি ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

হইয়াছি । তোমার সেই রাখালরূপে এবং এই ব্রাহ্মণ-সন্তানরূপে আমি যেন একই দেখিতেছি, কোনও পার্থক্য দেখিতেছি না । অবশ্য কখনও কখনও একটু পার্থক্য দেখি—তাহা কেবল তোমার মায়ারই খেলা । যাহাহউক, তুমি যেই হওনা কেন, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি ।” সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু তাঁহাকে প্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন ।

১০৯ । বলদেবের ভাবে প্রভুর আবেশের কথা বলিতেছেন । ১০৯-১১৪ পয়ারে । একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া “মধু আন, মধু আন” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ।

১১০-১১১ । শ্রীবলরাম মধুপ্রিয় ; “মধু আন”-ডাক শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বৃত্তিতে পারিলেন, প্রভুতে শ্রীবলরামের আবেশ হইয়াছে । শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গাজলের পাত্র আনিয়া প্রভুর সাক্ষাতে ধরিলেন\* । প্রভুও মধুজ্ঞানে সেই জলপান করিয়া বিহ্বল হইয়া—( মধুপানের মত্ততায় নয়—ভাবের মত্ততায় বিহ্বল হইয়া )—নৃত্য করিতে লাগিলেন । এই সময়ে সকলে শ্রীবলদেবের যমুনাকর্ষণ-লীলা দর্শন করিলেন ।

যমুনাকর্ষণ-লীলা—এক সময় শ্রীবলদেব রাসলীলা করিয়া জলবিহারের উদ্দেশে যমুনাকে আহ্বান করিলেন ; আহ্বানে যমুনা না আসায় তিনি যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া আনেন । শ্রীবলদেবের আবেশে প্রভু সকলকে এই লীলা দেখাইয়াছিলেন । শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৬৫ অধ্যায়ে এই লীলার বর্ণনা দ্রষ্টব্য ।

১১২-১১৩ । বলদেব-অনুকার—শ্রীবলদেবের তুল্য ( প্রভুর মদমত্ত-গতি ) । অনুকার—অনুকরণ, তুল্য । আচার্য্য-শেখর—চন্দ্রশেখর আচার্য্য । কোনও কোনও গ্রন্থে “আচার্য্য গোসাঁঞি” পাঠ দৃষ্ট হয় ; আচার্য্য-গোসাঁঞি—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য । তাঁরে দেখে—প্রভুকে দেখেন । রামাকার—রামের ( বলরামের ) আকার ( -বিশিষ্ট ) ; আচার্য্য দেখিলেন—ঠিক যেন শ্রীবলরামই তাঁহার রজত-ধবল শ্রীঅঙ্গ দোলাইয়া নৃত্য করিতেছেন । সোনার লাজল—শ্রীবলরামের অঙ্গ । বনমালী-আচার্য্য—বলদেব-ভাবে আবিষ্ট প্রভুর হাতে—সোনার লাজপও দেখিয়াছিলেন । সভে মিলি ইত্যাদি—সমস্ত ভক্ত আবেশে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ।

১১৪ । এইরূপে চারিপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্য করিয়া সন্ধ্যাকালে গঙ্গাস্নানের পরে সকলে নিজ নিজ গৃহে গেলেন ।

১১৫ । এক্ষণে কাজী-দমন-লীলা বর্ণনার আরম্ভ করিতেছেন । ঘরে ঘরে ( প্রত্যেক বাড়ীতে ) সঙ্কীৰ্ত্তন করার নিমিত্ত প্রভু নদীয়াবাসী সকলকে আদেশ করিয়াছিলেন । নগরিয়া লোকে—নবদ্বীপ-নগরবাসী লোকদিগকে ।

১১৬ । কোন পদটী কীৰ্ত্তন করার জন্ত প্রভুর আদেশ ছিল, তাহা বলিতেছেন—“হরয়ে নমঃ” ইত্যাদি ।

১১৭ । প্রভুর আদেশ অনুসারে সকলেই মৃদঙ্গ ও করতাল যোগে উচ্চ স্বরে “হরয়ে নমঃ”-ইত্যাদিরূপে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে লাগিল । তাহার ফলে দূর হইতে “হরি হরি”-ধ্বনি ব্যতীত নদীয়া-নগরে কিছুই শুনা যাইতেছিলনা ; অল্প সমস্ত শব্দই সঙ্কীৰ্ত্তনের উচ্চ ধ্বনিতে ডুবিয়া গিয়াছিল । আন—অল্প শব্দ ।

শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন ।  
কাজী-পাশে আসি সভে কৈল নিবেদন ॥ ১১৮  
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল ।  
মুদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল— ॥ ১১৯  
এতকাল কেহো নাহি কৈল হিন্দুয়ানী ।  
এবে যে উত্তম চালাও, কোন্ বল জানি ? ॥ ১২০  
কেহো কীৰ্ত্তন না করিহ সকল নগরে ।  
আজি আমি ক্ষমা করি-যাইতেছি ঘরে ॥ ১২১  
আর যদি কীৰ্ত্তন করিতে লাগ পাইমু ।

সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥ ১২২  
এত বলি কাজী গেল, নগরিয়া-লোক—।  
প্রভু স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শৌক ॥ ১২৩  
প্রভু আজ্ঞা দিল—যাহ, করহ কীৰ্ত্তন ।  
আমি সংহারিব আজি সকল যবন ॥ ১২৪  
ঘরে গিয়া সবলোক করে সন্কীৰ্ত্তন ।  
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে—চমকিত মন ॥ ১২৫  
তা-সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি ।  
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি ॥ ১২৬

গোর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

১১৮-১১৯ । নদীয়ায় যত যবন ছিল, নাম-সন্কীৰ্ত্তনের উচ্চ ধ্বনিতে তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং কাজীর নিকট যাইয়া নালিশ করিল । শুনিয়া কাজীও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সন্ধ্যাসময়ে কাজী নিজে—যে স্থানে কীৰ্ত্তন হইতেছিল, এমন এক বাড়ীতে আসিয়া মুদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং কীৰ্ত্তনকারীদিগকে শাসাইতে লাগিলেন । কাজী—যবনরাজার অধীনস্থ দেশাধ্যক্ষ ; ইনিও যবন ছিলেন । মহাপ্রভুর সময়ে যিনি নবদ্বীপের কাজী ছিলেন, তাহার নাম ছিল “চাঁদ কাজী” ; ইনি নাকি গোঁড়েশ্বর-নবাবের দৌহিত্র ছিলেন । তৎকালে কাজীর হাতেই বিচার-কার্যের ভার থাকিত । যবন—এস্থলে, মুদলমান ।

১২০-১২২ । কীৰ্ত্তনকারীদের প্রতি কাজীর উক্তি । হিন্দুয়ানী—হিন্দুধর্মের আচরণ । উত্তম চালাও—খুব আড়ম্বরের সহিত কীৰ্ত্তন চালাইতেছ । কোন্ বল জানি—কাহার বলে ? সর্বস্ব দণ্ডিয়া—যাহার যাহা কিছু আছে, তাহার তৎসমস্ত দণ্ড (সরকারে বাজেয়াপ্ত) করিয়া । জাতি যে লইমু—জাতি নষ্ট করিয়া মুসলমান করিয়া দিব । ক্রোধোত্তম কাজী উগ্রভাবে বলিলেন—“বলি, এতদিন পর্যন্ত কেহ কি নবদ্বীপে হিন্দুধর্মের আচরণ করে নাই ? কই, তখন তো এরূপ খোল-কবতালের সহিত উচ্চ হরি-ধ্বনির কলরব শুনি নাই ? কে তোমাদের এরূপ করিতে বলিয়াছে ? কাহার নিকটে জোর পাইয়া তোমরা এত ধুমধামের সহিত কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিয়াছ ? আমি আজ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া যাইতেছি ; কিন্তু খবরদার ! আমার এই নবদ্বীপে আর কখনও কেহ কীৰ্ত্তন করিও না । যদি শুনি কেহ কীৰ্ত্তন করিয়াছ, আর যদি তাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলে, তাহার যাহা কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইব ; কেবল উহাই নহে—তাহার জাতি নষ্ট করিয়া তাহাকে মুসলমান করিয়া দিব ; ইহা যেন মনে থাকে ।”

১২৩-১২৪ । ধমক দিয়া কাজী চলিয়া গেলেন । এদিকে কাজীর ভয়ে ভীত হইয়া নদীয়াবাসী লোকসকল মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া কাজীর কথা সমস্ত নিবেদন করিল । প্রভু তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন—“তোমাদের কোনও ভয় নাই ; তোমরা ঘরে যাইয়া কীৰ্ত্তন কর, সমস্ত যবনকে আমি আজ সংহার করিব ।” সংহারিব—ধ্বংস করিব । যবনের স্বভাব—কীৰ্ত্তনবিরোধিতা—দূর করিব ।

১২৫-১২৬ । প্রভুর কথায় সকলে ঘরে গিয়া কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিল ; কিন্তু পূর্বের গ্রায় স্বচ্ছন্দে—উৎসাহের সহিত প্রাণ খুলিয়া কেহই আর কীৰ্ত্তন করিতে পারিল না ; কখন আবার কাজী আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করে, এই ভয়ে সকলেই যেন থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল । প্রভু তাহাদের মনের ভয়ের কথা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন—।

নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন ।

সন্ধ্যাকালে কর সভে নগরমণ্ডন ॥ ১২৭

সন্ধ্যাতে দেউটী সব জাল ঘরে ঘরে ।

দেখো কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে ? ১২৮

এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায় ।

কীর্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১২৯

আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস ।

মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞি পরম উল্লাস ॥ ১৩০

পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র ।

তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩১

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১২৭-১২৮ । লোকদিগকে ডাকাইয়া প্রভু কি বলিলেন, তাহা প্রকাশ করিতেছেন । কর নগর মণ্ডন—সমস্ত নবদ্বীপ-নগরকে সজ্জিত কর ; সুন্দররূপে সাজাও । মণ্ডন—সজ্জা । দেউটী—মশাল ।

প্রভু বলিলেন—“আজ আমি সমস্ত নদীয়া-নগরে কীর্তন করিব । সন্ধ্যাকালে সকলেই নদীয়া-নগরটিকে সুন্দররূপে সাজাইবে, আর প্রত্যেক ঘরে মশাল জালিয়া আলোকিত করিবে । আজি আমি দেখিয়া লইব—কোন্ কাজী আসিয়া আমার কীর্তন নিষেধ করে ।”

১২৭-১২৮ পয়ারস্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে নিম্নলিখিত পাঠান্তর দৃষ্ট হয় :—“নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন । দেখি কোন্ কাজী আজি করে নিবারণ ॥ সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন । তিন সম্প্রদায় আজি করিব কীর্তন ॥ সন্ধ্যাতে দেউটী সব জাল ঘরে ঘরে । দেখো কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে ।” এই পাঠান্তরে “তিন সম্প্রদায় আজি করিব কীর্তন”—এই অংশ অতিরিক্ত আছে ।

১২৯-১৩১ । সম্প্রদায়—কীর্তনের দল । বুলে—ভ্রমণ করে । সন্ধ্যাকালে প্রভু কীর্তনের দল লইয়া বাহির হইলেন । তিন সম্প্রদায়ে কীর্তন চলিল । সর্বাগ্রের সম্প্রদায়ে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, মধ্যের সম্প্রদায়ে শ্রীল অদ্বৈত-আচার্য্য এবং পশ্চাতের সম্প্রদায়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীমরিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ বলেন, শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর মুসলমান-ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সর্বাগ্রে তাঁহাকে কীর্তন করিতে দেখিলে মুসলমানগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে ; এজন্য শ্রীল হরিদাসকে প্রথম সম্প্রদায়ে দেওয়া হইয়াছে । আর, শ্রীল অদ্বৈতের রূপায় শ্রীল হরিদাস বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাই তাঁহাকে দেখিলে তাহারা আরও ক্রুদ্ধ হইবে ; তাই শ্রীল হরিদাসের পরের সম্প্রদায়েই শ্রীল অদ্বৈতকে কীর্তন করিতে দেওয়া হইয়াছে ।

১২৪ পয়ারে প্রভু বলিয়াছেন,—তিনি সমস্ত যবনকে সংহার করিবেন । সংহার অর্থ প্রাণ-বিনাশ নহে ; শ্রীমন্ মহাপ্রভু কাহারও প্রাণ-বিনাশ করেন নাই ; এই অবতারে তিনি কোনও অস্ত্রও ধারণ করেন নাই ; “এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তশুদ্ধ করিল সভার ।” হরিনাম দিয়াই চিত্তশুদ্ধ করিয়া তিনি অস্ত্রের অস্ত্রত্ব, বিদ্বের বিদ্বত্ব ধ্বংস করিয়াছেন । প্রভুর অচকার মহাসকীর্তনের উদ্দেশ্যও হরিনাম-সকীর্তনের অদ্ভুত শক্তিতে যবনদিগের কীর্তন-বিদ্বত্ব ধ্বংস করা । কীর্তনের শক্তি ও কীর্তনের মাধুর্য্য ভক্তের মুখে যত বেশী বিকশিত হয়, তত আর কিছুতেই নহে ; ভক্তিমুখের কীর্তনে—অন্তের কথা তো দূরে—সর্বশক্তিমান্ স্বয়ংভগবান্ পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়া পড়েন । তাই বোধ হয় প্রভু নিজে সর্বাগ্রে না থাকিয়া শ্রীল হরিদাস এবং শ্রীল অদ্বৈতকে অগ্রে দিলেন ; এই দুই জনের মধ্যেও ভক্তিদ্বর্মের মহিমা-প্রখ্যাপন-বিষয়ে শ্রীল হরিদাসের এক অপূর্ব বিশেষত্ব আছে ; কারণ, ভক্তিদ্বর্মের মহিমায়—নামকীর্তনের মাধুর্য্যে—মুগ্ধ হইয়া তিনি স্বীয় কুলোচিত ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিদ্বর্মের—নামসকীর্তনের—আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । শ্রীঅদ্বৈত হিন্দু—ব্রাহ্মণ-সন্তান, ভক্তিদ্বর্ম তাঁহারই কুলোচিত ধর্ম ; এ বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত অপেক্ষা শ্রীল হরিদাসেরই বিশেষত্ব ; তাই বোধ হয় প্রভু সর্বাগ্রের সম্প্রদায়ে শ্রীল হরিদাসকে দিয়াছেন ।

সম্প্রদায়ের ক্রম-নির্দেশে প্রভু ইহাও দেখাইলেন যে, ভক্তির নিকটে জাতিকুলাদির বিচার নাই ; ভক্তির রূপা হইলে যবনকুলোদ্ভব ব্যক্তিও ব্রাহ্মণের সমান—এমন কি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের—স্থানও লাভ করিতে পারেন ।



বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে ।

বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপাবলে ॥ ১৩২

এইমত কীর্তন করি নগরে ভ্রমিলা ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে সতে কাজী দ্বারে গেলা ॥ ১৩৩

তর্জগর্জ করে লোক, করে কোলাহল ।

গৌরচন্দ্র-বলে—লোক প্রশয়-পাগল ॥ ১৩৪

কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে ।

তর্জগর্জগর্জ শুনি না হয় বাহিরে ॥ ১৩৫

উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন ।

বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা ।

১৩২। চৈতন্য মঙ্গলে—শ্রীচৈতন্যভাগবতে । শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ২৩শ অধ্যায়ে শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর প্রভুর এই সঙ্কীর্ণন-লীলা বিস্তৃতরূপ বর্ণন করিয়াছেন ।

১৩৩। কাজীদ্বারে—কাজীর বাড়ীর দরজায় ।

১৩৪। তর্জ গর্জ করে—তর্জন গর্জন করে, ক্রোধে । কোলাহল—কলরব, গুগোল । গৌরচন্দ্র-বলে—গৌরচন্দ্রের বলে ; গৌরচন্দ্রের প্রদত্ত উৎসাহে ; গৌরচন্দ্র সঙ্গে আছেন, এই সাহসে । প্রশয়-পাগল—প্রশয়বশতঃ পাগল বা উন্মত্ত । শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভয়বাণীতে, তাঁহার উৎসাহে, তিনি সঙ্গে আছেন—এই সাহসে কীর্তন-সম্প্রদায়ের লোকগণ যে প্রশয় পাইয়াছে, সেই প্রশয়বশতঃ তাহারা যেন উন্মত্তের মত হইয়াছে । অথবা, গৌরচন্দ্রের বলে ও প্রশয়ে লোক পাগলের ন্যায় হইয়াছে ।

১৩৫। কীর্তনের ধ্বনিতে—কীর্তনের ধ্বনি শুনিয়া ভয়ে । ভয়ের কারণ পরবর্তী ১৭১-১৭৮ পর্বারে ব্যক্ত হইয়াছে ।

১৩৬। কাজী যে পূর্বে মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহার প্রতিশোধ লওয়ার উদ্দেশ্যেই এক্ষণে কাজীর পুষ্পবন ও ঘরদ্বার ভাঙ্গা হইল । শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ২৩শ অধ্যায়ে এই লীলা বর্ণন করিয়াছেন ।

কাজী ছিলেন রাজ-প্রতিনিধি, রাজার শক্তিতে শক্তিমান ; তাঁহার অপমানে রাজার অপমান । আত্মরক্ষার জ্ঞ—নিজের ও রাজার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জ্ঞ—তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা—যথেষ্ট লোকজন পাইক-পেয়াদাও ছিল । এ সমস্তের বলে বলীয়ান হইয়াই তিনি স্বয়ং কীর্তনকারীদের বাড়ীতে গিয়া মৃদঙ্গ ভাঙিতে এবং ভবিষ্যতে সর্ব্বশ বাজেয়াপ্ত করার—এমন কি জাতি নষ্ট করার ধমক দিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই । কিন্তু আজ সহস্র সহস্র লোক—যাহাদের প্রত্যেকেই কাজীর প্রজা, কাজীর শাসনের দীয়ার মধ্যে অবস্থিত এবং যাহারা নিজ নিজ বাড়ীতে রসিয়া কীর্তন করিলেও কাজীর হুকুমে তাঁহাদের সর্ব্বশ এবং জাতি পর্য্যন্ত হারাইবার ভয়ে ভীত ছিলেন, তাঁহারা—গগন-বিদারী কীর্তনধ্বনি করিতেছেন—তাঁহাদের নিজ বাড়ীতে নয়—রাজপথে নয়—পরন্তু স্বয়ং কাজী-সাহেবের বাড়ীতে । কেবল তাহাই নহে—কাজীকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা হুঙ্কার দিতেছেন, তর্জন গর্জন করিতেছেন, লক্ষ-বাম্প দিতেছেন—এমন কি, কাজীর পুষ্পবন, ঘর-দ্বার পর্য্যন্তও নষ্ট করিতেছেন !! আর কাজী আছেন অন্তঃপুরে লুকাইয়া !! তাঁহার রক্ষক পাইক-পেয়াদা কোথায় আছে, তাহারাই জানে ! কীর্তনোন্মত্ত লোকগুলিকে বাধা দেওয়ার নিমিত্ত টু-শব্দটী করার জ্ঞও একটা লোক কোথায়ও দেখা যায় না !! ইহার কারণ কি ? কাজীর দোঁদীও প্রতাপ, তাঁহার রাজশক্তি—আজ কোথায় কেন আত্মগোপন করিল ? উত্তর বোধ হয় এই :—রাজা প্রাকৃত-শক্তিতে শক্তিমান ; সেই শক্তিও আবার অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটা ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতর এক অংশে মাত্র কার্য্যকরী ; কাজীর শক্তি তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর । আর আজ কাজীর বাড়ীতে যিনি উপস্থিত—যাহার বলে কীর্তনোন্মত্ত লোকসকল বলীয়ান, তিনি—অনন্ত-কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু ঐশ্বর্য্যশক্তি আছে, অনন্ত-কোটি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদিতে যত কিছু ঐশ্বর্য্যশক্তি আছে, তৎসমস্তের একমাত্র অধিপতি তিনি, তাঁহার শক্তির ক্ষুদ্র এক কণিকার আভাস মাত্র পার্থিব রাজার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য । তাঁহার শক্তির তুলনায় কাজীর শক্তি—কোটি সূর্য্যের তুলনায় ক্ষুদ্র খণ্ডোতকের শক্তি অপেক্ষাও তুচ্ছ—তাই

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা ।  
 ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা ॥ ১৩৭  
 দূরে হৈতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া ।  
 কাজীরে বসাইলা প্রভু সন্মান করিয়া ॥ ১৩৮  
 প্রভু বোলে, আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত ।  
 আমা দেখি লুকাইলা, এ ধর্ম্য কেমনত ? ॥ ১৩৯  
 কাজী কহে, তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া ।  
 তোমা শাস্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥ ১৪০  
 এবে তুমি শাস্ত হৈলে, আসি মিলিলাম ।

ভাগ্য মোর, তোমা হেন অতিথি পাইলাম ॥ ১৪১  
 গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা ।  
 দেহসম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রামসম্বন্ধ সাঁচা ॥ ১৪২  
 নীলাম্বরচক্রবর্তী হয় তোমার নানা ।  
 সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৪৩  
 ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয় ।  
 মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥ ১৪৪  
 এইমতে দৌহার কথা হয় ঠারেঠোরে ।  
 ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে ॥ ১৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

আজ স্তিমিত । অথবা, কাজীর শক্তির মূল উৎস স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্র স্বীয় ঐশ্বর্য্য লইয়া যেখানে উপস্থিত, সেখানে কাজীর শক্তির অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা । মহাসমুদ্রের জল পাইয়া যে ক্ষুদ্র নালার উৎপত্তি, মহাসমুদ্রকর্তৃক প্রাবিত হইলে তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা ।

১৩৭। তার দ্বারেতে—কাজীর দ্বারেতে । ভব্য লোক—শিষ্ট বা সম্ভ্রান্ত যোগ্য লোক । বোলাইয়া—ডাকাইয়া আনিলেন ।

১৩৮। দূর হৈতে—ইত্যাদি—কাজী দূর হইতেই মাথা নোঙাইয়া আসিলেন, প্রভুর প্রতি সন্মান প্রদর্শনার্থ ।

১৩৯। অভ্যাগত—অতিথি । কাজীকে অপ্রতিভ করার উদ্দেশ্যে চতুর-চুড়ামণি প্রভু বলিলেন—“আমি তোমার বাড়ীতে অতিথি আসিলাম ; অথচ তুমি আমাকে দেখিয়া ঘরে গিয়া লুকাইয়া রহিলে । ইহা তোমার কিরূপ ধর্ম্য !” অতিথি আসিলে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করাই সদাচার-সম্মত ব্যবহার ।

১৪০-১৪১। এই দুই পয়ারে কাজী যাহা বলিলেন, তাহার বাঞ্ছনা বোধ হয় এই যে,—“তুমি যে অতিথিরূপে আসিয়াছ, তাহা মনে করিতে পারি নাই ; কারণ, অতিথি ক্রুদ্ধ হইয়া আসেনা, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ—তোমার লোকজনের তর্জ্জন গর্জ্জন-হুঙ্কার, তাহাদের দ্বারা আমার ঘর-দ্বার-পুষ্পবনাদির ধ্বংস, আর তাহাতে তোমার উদাসীনতা, এ সমস্ত হইতেই তোমার ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । যাহা হউক, তুমি যখন বলিতেছ—তুমি আমার অতিথি, তখন ইহা আমার পরম-সৌভাগ্যই ; কারণ, তোমার গ্রাম অতিথি পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটেনা ।”

১৪২-১৪৩। পরবর্তী ১৭১-১৭৮ পয়ার হইতে জানা যায়, কাজী অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন ; এক্ষণে প্রভু যখন বলিলেন, তিনি কাজীর অতিথিরূপে আসিয়াছেন, তখন কাজীর মনে একটু ভরসা হইল ; এই ভরসাতেই, সম্ভবতঃ প্রভুকে একটু সন্তুষ্ট করার জগুই, প্রভুর সহিত গ্রাম-সম্বন্ধের কথা উত্থাপিত করিতেছেন ।

চক্রবর্তী—নীলাম্বর-চক্রবর্তী, প্রভুর মাতামহ । চাচা—খুড়া । সাঁচা—সত্য ; শ্রেষ্ঠ । নানা—মাতামহ । ভাগিনা—ভাগিনেয় ; ভগিনীর পুত্র ।

১৪৪। গ্রামসম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া প্রভুর ক্রোধ দূর করার উদ্দেশ্যে গূঢ়-মিনতির সুরেই যেন কাজী বলিলেন—“তুমি আমার ভাগিনেয়, আমি তোমার মামা । ভাগিনেয়ের অত্যাচার, আবদার—স্নেহবশতঃ মামা নিশ্চয়ই সহ্য করিয়া থাকে ; ইহা স্বাভাবিক । আবার মামা যদি ভাগিনেয়ের কাছে কোনও অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অপরাধ উপেক্ষা করাও ভাগিনেয়ের পক্ষে উচিত ।”

এস্থলে কাজী ভক্তিতে—মৃদঙ্গ-ভঙ্গ এবং কীর্ত্তন-নিষেধ জনিত অপরাধের জগু ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ।

১৪৫। দৌহার—প্রভুর ও কাজীর । ঠারেঠোরে—ইঙ্গিতে । ভিতরের অর্থ—মৃদঙ্গ-ভঙ্গ ও কীর্ত্তন-নিষেধ-জনিত অপরাধের জগু ক্ষমা-প্রার্থনাই বোধ হয় কাজীর উক্তির ভিতরের অর্থ ।

প্রভু কহে—প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।  
 কাজী কহে—আজ্ঞা কর যে তোমার মনে ॥ ১৪৬  
 প্রভু কহে—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা  
 বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তৈঁহো পিতা ॥ ১৪৭  
 পিতা-মাতা মারি খাও—এবা কোন্ ধর্ম ? ।

কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম ? ॥ ১৪৮  
 কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ ।  
 তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব কোরাণ ॥ ১৪৯  
 সেই শাস্ত্রে কহে—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গভেদ ।  
 নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ ॥ ১৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৪৬ । প্রশ্ন লাগি—কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্ত । আজ্ঞা কর ইত্যাদি—তোমার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর ।

১৪৭-১৪৮ । গো-দুগ্ধ—গাভীর দুগ্ধ । মাতা—দুগ্ধ দান করে বলিয়া গাভী মাতা । বৃষ—বাঁড় । উপলক্ষ্যে পুরুষ-জাতীয় গরু । উপজায়—উৎপাদন করে, জন্মায় । কৃষিকর্মান্দির সহায়তা করিয়া খাত-উৎপাদন করে বলিয়া বৃষ লোকের পিতৃতুল্য । পিতামাতা মারি ইত্যাদি—পিতৃ-মাতৃতুল্য গোজাতিকে মারিয়া খাও, ইহা তোমার কিরূপ ধর্ম ? গো-বধ কর কেন ? বিকর্ম—নিন্দিত কর্ম, পাপকর্ম ।

১৪৯ । কেতাব—গ্রন্থ । কোরাণ—মুসলমানদের প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থের নাম কোরাণ । মুসলমানগণ বলেন, মহাত্মা মহম্মদের যোগে এই গ্রন্থ ভগবান্ কর্তৃক প্রকটিত হইয়াছে । ইহা ভগবানেরই বাণীতে পূর্ণ । হিন্দুর নিকটে বেদ-পুরাণ যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের বস্তু, মুসলমানের নিকটেও কোরাণ তেমনি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র । বস্তুতঃ আত্মধর্ম-বিষয়ক মূলনীতি-বিষয়ে কোরাণ এবং বেদ-পুরাণের বাণীতে বিশেষ কিছু পার্থক্যও নাই ।

১৫০ । সেই শাস্ত্রে—কোরাণ-শাস্ত্রে । প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গভেদ—প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, এই দুইটি বিভিন্ন পন্থা । ইন্দ্রিয়-সংযমের নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রেও এই দুইটি পন্থার উল্লেখ পাওয়া যায় । নিবৃত্তিমার্গ ইন্দ্রিয়ের কোনওরূপ আকাজক্ষা-পূরণেরই পক্ষপাতী নহে; প্রবৃত্তিমার্গ সংযত-ভাবে ইন্দ্রিয়ের আকাজক্ষাপূরণের পক্ষপাতী । যাহারা প্রবৃত্তিমার্গের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধায় কখনও কোনওরূপ আহার না যোগাইলে, বাধ্যপ্রাপ্ত শ্রোতব্রতীর ন্যায়, তাহা আরও প্রবলতর হইয়া উঠিবে, তখন তাহাকে দমন করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে । স্থলবিশেষে, আহার-অভাবে কোনও কোনও ইন্দ্রিয় দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার আকাজক্ষা অন্তর্হিত হইবে না; আকাজক্ষার নিবৃত্তিতেই সংযম । তাই তাঁহারা বলেন, ইন্দ্রিয়কে যথেষ্ট আহার না দিয়া—প্রবৃত্তির শ্রোতে সম্যকরূপে আত্মসমর্পণ না করিয়া—সময় সময় সংযতভাবে তাহাকে কিছু কিছু আহার দিয়া ক্রমশঃ তাহাকে বশীভূত করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুশাস্ত্রে যজ্ঞার্থে পশুহননের ব্যবস্থা । লোকের মাংস খাওয়ার প্রবৃত্তি আছে; নানা কারণে যথেষ্ট মাংসভোজনও শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে; যাহারা মোটেই মাংস না খাইয়া পারেন, তাদের পক্ষে ভালই; আর যাহারা না খাইয়া পারেন না, তাদের জগৎ ব্যবস্থা এই যে, যজ্ঞোপলক্ষে পশুবধ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিবে । এইরূপে যজ্ঞার্থ পশুহননের ব্যবস্থা করিয়া যখন তখন, যেখানে সেখানে যে কোনও প্রাণীর মাংস-ভোজন নিষেধ করা হইল—উদ্দেশ্য, এই ভাবে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধাকে সন্মুচিত করিয়া আনা । এই পন্থাকে বলে প্রবৃত্তিমার্গ । আর যাহারা নিবৃত্তিমার্গের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, প্রবৃত্তিমার্গ ইন্দ্রিয়-সংযমের অন্তর্কুল নহে; দৃঢ়দ্বারা অগ্নি যেমন বন্ধিতই হয়, তদ্রূপ যজ্ঞাদি বিশেষ উপলক্ষ্যে হইলেও, কিছু আহার পাইলেই ইন্দ্রিয়গ্রাম বলবান্ হইয়া উঠিবে । তাই তাঁহারা বলেন, কঠোর ভাবে ইন্দ্রিয়ের শাসন—ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধায় কোনওরূপ আহার না যোগানই ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রকৃষ্ট পন্থা; ইহাই নিবৃত্তিমার্গ । যজ্ঞার্থে যে পশুহননের বিধি আছে, তাহাকে পরিসংখ্যা-বিধি বলে; ইহা বাধ্যতামূলক বিধি নহে—যজ্ঞোপলক্ষে পশুহনন করিয়া যে ভোজন করিতেই হইবে, তাহা নহে; যদি মাংস-ভোজন না করিয়া থাকিতে না পার, তবে যজ্ঞোপলক্ষে নিহত পশুর মাংস খাইবে—অন্য মাংস খাইও না । যজ্ঞে নিহত পশুর মাংস যে খাইতেই হইবে,

প্রবৃতিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয় ।  
 শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপভয় ॥ ১৫১  
 তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী ।  
 অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥ ১৫২  
 প্রভু কহে—বেদে কহে গোবধ নিষেধে ।  
 অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে ॥ ১৫৩  
 জীয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী ।  
 বেদ পুরাণে ঐছে আছে আজ্ঞাবাণী ॥ ১৫৪  
 অতএব জরদগব মারে মুনিগণ ।

বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন ॥ ১৫২  
 জরদগব হঞা যুবা হয় আর বার ।  
 তাতে তার বধ নহে হয় উপকার ॥ ১৫৩  
 কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে ।  
 অতএব গোবধ কেহো না করে এখনে ॥ ১৫৭  
 তথাহি ব্রহ্মবৈবর্তে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৮৫।১৮৬)  
 অশ্বমেধং গবালন্তং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।  
 দেবরেন স্মৃতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অশ্বমেধমিতি । অশ্বমেধঃ অশ্ববধনিষ্পন্নমাগ-বিশেষঃ গবালন্তঃ গোবধনিষ্পন্নগোমেধাখ্যায়াগ-বিশেষঃ সন্ন্যাসঃ, পলপৈতৃকঃ মাংসেন পিতৃশ্রাদ্ধং, দেবরেন পত্ন্যভ্রাতৃ করণেন স্মৃতোৎপত্তিং এতানি পঞ্চ কলৌ কলিযুগে বিবর্জয়েৎ ॥ ৭।

গৌর-কৃপা-ভরস্বিনী টীকা ।

তাহাও নয় । না থাইয়া থাকিতে পারিলে থাইও না ।—ইহাই পরিসংখ্যা-বিধির তাৎপর্য । যজ্ঞার্থে পশুহননের বিধি প্রবৃতিমার্গের বিধি—ইহাও পরিসংখ্যা বিধিমাত্র; যজ্ঞে পশুহনন না করিলেও প্রত্যাবায় নাই,—আহারের প্রয়োজন হইলে করিবে; ইহাই উদ্দেশ্য । কিন্তু নিবৃতিমার্গে যখন কোনও অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়ার আহার যোগানের পক্ষপাতী নয়, তখন তাহা যজ্ঞে পশুহননের পক্ষপাতীও নহে; তাই নিবৃতিমার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ—নিবৃতিমার্গাবলম্বীদের মতে কোনও সময়েই কোনও জীবের প্রাণবধ করা সঙ্গত নহে । পাকের চুলায়, ঢেকিতে, জলের কলসের নীচে, যাতায়াতাদিতে লোক-মাত্রের পক্ষেই অনেক দৃশ্য ও অদৃশ্য ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণসংহার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; ইহাতেও পাপ আছে এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও আছে ।

১৫১ । প্রবৃতিমার্গে কোরাণ-শাস্ত্রের মতে গোবধ করার বিধি আছে; শাস্ত্রবিধি আছে বলিয়া এইরূপ গোবধে পাপের আশঙ্কা নাই ।

১৫২ । কাজী বলিতেছেন—“কেবল যে কোরাণেই গোবধের কথা আছে, তাহা নহে; বেদেও গোবধের কথা আছে; তাই বড় বড় মুনি-ঋষিরাও গোবধ করিতেন ।”

১৫৩-১৫৭ । আজ্ঞাবাণী—আদেশ । জরদগব—জরাগ্রস্ত ( বৃদ্ধ ) গরু । বেদমন্ত্রে—বেদের মন্ত্রে ।

কাজীর কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“বেদে গোবধ নিষিদ্ধ; তাই হিন্দুগণ এখন গোবধ করেনা । তবে বেদে এবং পুরাণে এইরূপ আদেশ আছে যে, যদি মারিয়া কেহ পুনরায় বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি গোবধ-যজ্ঞে গোবধ করিতে পারেন । প্রাচীনকালের মুনিগণের তাদৃশী শক্তি ছিল, তাই তাঁহারা বৃদ্ধা গরু মারিতেন; মারিয়া কিন্তু বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আবার বাঁচাইতেন; যখন গরুটি আবার বাঁচিয়া উঠিত, তখন তাহা আর বৃদ্ধা থাকিতনা, যুবা হইয়া উঠিত; তাই তাদৃশ গোবধে গরুর অপকার না হইয়া উপকার হইত—প্রকৃত বধ হইত না । কিন্তু কলিকালের ব্রাহ্মণের সেই শক্তি নাই, তাঁহারা কোনও প্রাণীই মারিয়া পুনরায় বাঁচাইতে পারেন না; তাই বলিতে গোবধ নিষেধ ।” কলিতে গোবধ-নিষেধের প্রমাণরূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৭। অশ্বয় । অশ্বমেধঃ ( অশ্বমেধ-যজ্ঞ ), গবালন্তঃ ( গোমেধ-যজ্ঞ ), সন্ন্যাসঃ ( সন্ন্যাস ), পলপৈতৃকম্ ( মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ ), দেবরেন ( স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বারা ) স্মৃতোৎপত্তিং ( পুত্রোৎপাদন ) [ ইতি ] ( এই ) পঞ্চ ( পাঁচটি ) কলৌ ( কলিযুগে ) বিবর্জয়েৎ ( বর্জন করিবে ) ।

তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার ।  
 নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৫৮  
 গরুর যতেক রোম, তত সহস্র বৎসর ।  
 গোবধী রৌরবমধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৫৯  
 তোমা-সভার শাস্ত্রকর্তা—সেহো ভ্রান্ত হৈল ।

না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম—এঁছে আত্মা দিল ॥ ১৬০  
 শুনি শুক হৈল কাজী, নাহি ক্ষুরে বাণী ।  
 বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি ॥ ১৬১  
 তুমি যে কহিলে পণ্ডিত ! সেই (সব) সত্য হয় ।  
 আধুনিক আমার শাস্ত্র,—বিচারসহ নয় ॥ ১৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অনুবাদ ।—অশ্বমেধ-যজ্ঞ, গোমেধযজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরদ্বারা স্মৃতোৎপাদন,—কলিযুগে এই পাঁচটি বর্জন করিবে । ৭ ।

অশ্বমেধ—একরকম যজ্ঞ, ইহাতে ঘোড়া বধ করিতে হয় । গবালন্ত—একপ্রকার যজ্ঞ, ইহাতে গোবধ করিতে হয় । পলপৈতৃক—মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ । দেবর—স্বামীর ছোটভাই । স্মৃতোৎপাদন—পুল্লোৎপাদন, পুল্লজন্মান । অশ্বমেধাদি যে পাঁচটি অনুষ্ঠানের কথা বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেকটাই অনাত্মধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত, দেশ-কালের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনাত্মধর্ম্মেরও পরিবর্তন হয় (ভূমিকায় ধর্ম্ম-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) । অশ্বমেধাদি পাঁচটি অনুষ্ঠান পূর্বে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল ; দেশ-কালের অনুপযোগী বলিয়া পরবর্তী সময়ে যে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক ।

১৫৮-৫৯ । তোমরা—তোমার ( কাজীর ) গায় মুসলমানগণ । জীয়াইতে নার—বাঁচাইতে পার না । বধমাত্র সার—তোমাদের গোহত্যা বিগত হত্যাতেই পর্য্যবসিত হয় । প্রাচীনকালের ঋষিগণ বাঁচাইতে পারিতেন বলিয়া তাঁদের গোহত্যা প্রকৃত প্রস্তাবে হত্যা হইত না । নরক—গোবধের ফলে নরক গমন । গোবধী—গোহত্যাকারী । রৌরব মধ্যে—রৌরব নামক নরকের মধ্যে ।

১৬০ । না জানি ইত্যাদি—পুনরায় যে বাঁচাইতে পারে না, সে যদি গো-হত্যা করে, তাহা হইলে যে “গরুর যত রোম, তত সহস্র বৎসর” রৌরব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা না জানিয়াই তোমাদের ( মুসলমানদের ) শাস্ত্র-কর্তা প্রবৃত্তিমার্গে গোবধের বিধি দিয়াছেন । ১৫৩-১৬০ পয়ার কাজীর প্রতি প্রভুর উক্তি ।

১৬১ । শুনি—প্রভুর বাক্য শুনিয়া । নাহি ক্ষুরে বাণী—কথা বন্ধ হইল । বিচারিয়া—প্রভুর সমস্ত কথা বিচার করিয়া । পরাভব মানি—পরাজয় স্বীকার করিয়া । ১৬৪ পয়ারের পূর্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত কাজীর উক্তি ।

১৬২ । আধুনিক—হিন্দুর বেদ-পুরাণ অপেক্ষা পরবর্তী কালের লিখিত । মুসলমানধর্ম্ম-প্রবর্তক হজরত-মহম্মদ কর্তৃক কোরাণ প্রচারিত হইয়াছে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ( ৫৭০ খৃঃ অঃ হইতে ৬৩২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ) মহম্মদ প্রকট ছিলেন । হিন্দুদের বেদ-পুরাণ তাহার বহু পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল । কোরাণ লিখিত হইয়াছে আরব-দেশে ; স্মৃতরাং কোরাণের খাতিখাতবিষয়ক বিধিসমূহ তৎকালীন আরবদেশবাসীদের অবস্থারই অনুকূল ছিল বলিয়া মনে হয় । আমার শাস্ত্র—মুসলমানের কোরাণ শাস্ত্র । বিচারসহ নয়—বিচার করিয়া দেখিতে গেলে যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । “বিচারসহ”—স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “বিচারস্থ”—পাঠান্তর আছে ; বিচারস্থ—বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ; বিচারসহ । প্রভু গোবধ-সম্বন্ধেই কাজিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; কাজির উক্তিও গোবধ-সম্বন্ধেই, আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে নহে ।

১৬৩ । কল্লিত আমার শাস্ত্র—আমার ( কাজীর—মুসলমানের ) শাস্ত্র লেখকের নিজের কল্পনা মাত্র । কাজীর মুখে মুসলমানদের শাস্ত্রসম্বন্ধে যে “বিচার-সহ নয়” এবং “কল্লিত” এই দুইটি কথা বাহির করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কাজীর অভিমত বোধ হয় কোনও মুসলমানই অনুমোদন করিবেন না ; নিজের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এরূপ অভিমত প্রকাশ করার পক্ষে কাজীর যথেষ্ট কারণ ছিল—পরবর্তী ১৭১—১৮০ পয়ার পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে । তবে একথা



কল্পিত আমার শাস্ত্র, আমি সব জানি ।

জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥ ১৬৩

সহজে যবন শাস্ত্র অদৃঢ়বিচার ।

হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আর বার—॥ ১৬৪

আর এক প্রশ্ন করি, শুন তুমি মামা !

যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥ ১৬৫

তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীৰ্তন ।

বাঙগীতকোলাহল সঙ্কীৰ্তন-নর্তন ॥ ১৬৬

তুমি কাজী হিন্দুধর্ম বিরোধে অধিকারী ।

এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি ॥ ১৬৭

কাজী বোলে—সভে তোমায় বোলে গৌরহরি ।

সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি ॥ ১৬৮

শুন গৌরহরি ! এই প্রশ্নের কারণ ।

নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥ ১৬৯

প্রভু বোলে—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয় ।

স্ফুট করি কহ তুমি, নাহি কিছু ভয় ॥ ১৭০

কাজী কহে—যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া ।

কীর্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥ ১৭১

সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর ।

নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥ ১৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অবশ্যই স্বীকার্য্য হইতে পারে যে, যে সময়ে যে দেশে কোরাণ লিখিত হইয়াছিল, সেই সময়ের এবং সেই দেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শাস্ত্রকার গোবধের বিধি দিয়াছিলেন ; কিন্তু মহাপ্রভুর সহিত কাজীর আলোচনা যে সময়ে এবং যে স্থানে হইতেছিল, হয় তো সেই সময়ের এবং সেই স্থানের—ভারতবর্ষের—উপযোগী ছিল না—কয়েক শত বৎসর পূর্বের লিখিত কোরাণে গোবধের বিধি থাকিলেও কাজীর সময়ে সেই বিধি “বিচার সহ” ছিল না—ইহাই বোধ হয় কাজীর উক্তির তাৎপর্য্য ছিল ।

জাতি-অনুরোধে ইত্যাদি—আমি মুসলমান বলিয়া মুসলমান-শাস্ত্রের প্রতি মর্যাদা দেখাই মাত্র ।

১৬৪ । সহজে—স্বভাবতঃই । যবন-শাস্ত্র—মুসলমানের শাস্ত্র । অদৃঢ় বিচার—দৃঢ় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার পূর্বক লিখিত নহে । ( পূর্ববর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ) ।

গোবধ-সম্বন্ধে কাজীকে প্রভু যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে প্রশ্নের উত্তরে কাজী স্পষ্ট কথাতেই পরাজয় স্বীকার করিলেন ; প্রভু তাহাতে একটু হাসিলেন ; হাসিয়া তাঁহাকে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ।

১৬৫-৬৭ । ছলে ইত্যাদি—ছলনা করিয়া—প্রকৃত কথা গোপন করিয়া—আমাকে প্রতারণা করিওনা । হিন্দুধর্ম-বিরোধে অধিকারী—মুসলমান-রাজার অধীনে মুসলমান-বিচারপতি বলিয়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণে তোমার অধিকার বা ক্ষমতা আছে—তুমি বিরুদ্ধাচরণ করিলে কেহই কিছু বলিতে সাহস করিবে না, কেহ তোমার প্রতিকূল আচরণও করিবে না ।

প্রভু প্রশ্ন করিলেন—“মামা, আমাকে একটি কথা সত্য করিয়া বলিবে ; সত্য গোপন করিয়া আমাকে প্রতারণা করিওনা । কথাটা এই—তোমার নগরে নিত্যই সঙ্কীৰ্তন হইতেছে, তাহাতে নৃত্য হইতেছে, বাঙগীতের কত কোলাহল হইতেছে । তুমি মুসলমান-কাজী, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে তোমার ক্ষমতা আছে ; কিন্তু তুমি এই কোলাহলময় নৃত্যকীর্তনে বাধা দিতেছনা কেন ?”

কাজীর ভিতরের কথা বাহির করার উদ্দেশ্যেই প্রভু এই প্রশ্ন করিলেন ।

১৬৯ । নিভৃত—নির্জন । কাজী বলিলেন—“কীর্তনে বাধা না দেওয়ার কারণ তোমাকে বলিতে পারি ; তবে এত লোকের সাক্ষাতে বলিতে পারি না, তোমার নিকটে গোপনে বলিতে পারি ।”

১৭০ । অন্তরঙ্গ—নিতান্ত আপনার জন । স্ফুট করি—প্রকাশ করিয়া, খুলিয়া ।

১৭২ । নরদেহ সিংহমুখ—মাহুধের মত দেহ—দুই হাত, দুই চরণ—কিন্তু মুখ খানা সিংহের মুখের মতন । কাজীর বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীসিংহদেবই কাজীকে দর্শন দিয়াছিলেন ।

শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চটি ।  
 অটুঅটু হাসে, করে দন্ত কড়মড়ি ॥ ১৭৩  
 মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বোলে—  
 ফাঁড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥ ১৭৪  
 মোর কীর্তন মানা করিস, করিমু তোর ক্ষয় !  
 আখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥ ১৭৫  
 ভীত দেখি সিংহ বোলে হইয়া সদয়—  
 তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥ ১৭৬  
 সেদিন বহুত নাহি কৈল উৎপাত ।  
 তেত্রি ক্ষমা করিয়া না কৈলুঁ প্রাণাঘাত ॥ ১৭৭  
 ঐছে যদি পুন কর, তবে না সহিমু ।  
 সবংশে তোমারে মারি ঘরন নাশিমু ॥ ১৭৮  
 এত কহি সিংহ গেল মোর হৈল ভয় ।  
 এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥ ১৭৯  
 এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল ।  
 শুনি দেখি সর্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥ ১৮০

কাজী কহে—ইহা আমি করে না কহিল ।  
 সেই দিন আমার এক পেয়াদা আইল ॥ ১৮১  
 আসি কহে—গেলুঁ মুঞি কীর্তন নিষেধিতে ।  
 অগ্নি-উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥ ১৮২  
 পুড়িলা সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ ।  
 যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ ॥ ১৮৩  
 তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা ।  
 কীর্তন না বর্জ্জিহ, ঘরে রহ ত বসিয়া ॥ ১৮৪  
 তবে ত নগরে হৈবে স্বচ্ছন্দে কীর্তন ।  
 শুনি সব শ্রোচ্ছ আসি কৈল নিবেদন— ॥ ১৮৫  
 নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার ।  
 হরিহরধ্বনি বিনা নাহি শুনি আর ॥ ১৮৬  
 আর শ্রোচ্ছ কহে—হিন্দু ‘কৃষ্ণকৃষ্ণ’ বলি ।  
 হাসে কান্দে নাচে গায়—গড়ি যায় ধূলি ॥ ১৮৭  
 ‘হরিহরি’ করি হিন্দু করে কোলাহল ।  
 পাৎসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল ॥ ১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী ঢাকা ।

১৭৪ । ফাঁড়িমু—চিরিয়া ফেলিব । মৃদঙ্গ বদলে—তুমি মৃদঙ্গ ভাদিয়াছ, আমি তোমার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইব ।

১৭৫ । এই পয়ার হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুই নৃসিংহরূপে কাজীকে কৃপা করিয়াছিলেন ।

১৭৭ । তেত্রি—তজ্জগত । প্রাণাঘাত—প্রাণনাশ ।

১৭৯ । ‘নখচিহ্ন’—নখ দ্বারা বক্ষোবিদারণের চিহ্ন । কাজী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, নৃসিংহদেব তাঁহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়াছেন ; জাগ্রত হইয়াও দেখিলেন, বক্ষে নখচিহ্ন রাইয়াছে । প্রভু যে দিন কীর্তন লইয়া আসিলেন, সেই দিনও সেই চিহ্ন বর্তমান ছিল ।

১৮১-৮৩ । নিজের উপর নৃসিংহের শাসনের কথা বলিয়া কাজীর লোকজনের উপরেও যে অলৌকিক শাসন হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিতেছেন ।

অগ্নি-উল্কা—আগুনের উল্কা ; শূল হইতে আগত অগ্নিরাশি । পেয়াদা—পদাতিক । ব্রণ—ক্ষত । পেয়াদার দাড়ি পুড়িয়া গেল, মুখে ক্ষত হইল । কিন্তু কোথা হইতে আগুন আসিল কেহ বলিতে পারে না ।

১৮৪-৮৫ । না বর্জ্জিহ—নিষেধ করিও না । তবেত ইত্যাদি—নগরে স্বচ্ছন্দে কীর্তন চলিবে আশঙ্কা করিয়া ।

১৮৭ । গড়ি যায় ধূলি—ধূলায় গড়াগড়ি যায় ।

১৮৮ । পাৎসা—বাদসাহ । করিবেক ফল—শাস্তি দিবেন ।

তবে সেই যবনেরে আমি ত পুছিল—

হিন্দু ‘হরি’ বোলে—তার স্বভাব জানিল ॥ ১৮৯

তুমি ত যবন হইয়া কেনে অনুক্ষণ ।

হিন্দুর দেবতার নাম লও কি কারণ ? ॥ ১৯০

শ্লেচ্ছ কহে—হিন্দুরে আমি করি পরিহাস ।

কেহো কেহো কৃষ্ণদাস, কেহো রামদাস ॥ ১৯১

কেহো হরিদাস, বোলে ‘হরিহরি’ ।

জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ১৯২

সেই হইতে জিহ্বা মোর বোলে ‘হরিহরি’ ।

ইচ্ছা নাঞি, তবু বোলে, কি উপায় করি ? ॥ ১৯৩

আর শ্লেচ্ছ কহে—শুন আমি এইমতে ।

হিন্দুকে পরিহাস কৈল, সেই দিন হৈতে ॥ ১৯৪

জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে না মানে বর্জন ।

না জানি কি মন্ত্রোষধি করে হিন্দুগণ ॥ ১৯৫

এত শুনি তা সভারে ঘরে পাঠাইল ।

হেনকালে পাষণ্ডি-হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥ ১৯৬

আমি কহে—হিন্দুর ধর্ম্য ভাঙ্গিল নিমাই ।

যে কীর্তন প্রবর্তাইল, কভু শুনি নাই ॥ ১৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৮৯-১৯০ । কাজী আরও এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিতেছেন । যে সমস্ত মুসলমান হিন্দুর কীর্তন নিষেধ করে না বলিয়া কাজীকে বাদসাহের রোষের ভয় দেখাইতে আসিত, তাহাদেরই একজন অনবরত “হরি হরি” ধ্বনি করিত ।

১৯১-১৯৩ । যবন হইয়া সে কেন হরিনাম করিতেছে, কাজী এই প্রশ্ন করিলে সে বলিল :—হিন্দুদের কেহ “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলে, কেহ “রাম রাম” বলে, কেহ “হরি হরি” বলে । তাই আমি উপহাস করিয়া বলিলাম “তুমি কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল, তুমি বুঝি কৃষ্ণদাস হইয়াছ ! তুমি কেবল রাম রাম বলিয়া চীৎকার কর, তুমি বুঝি বেটা রামদাস হইয়াছ ! আর তুমি কেবল “হরি হরি” বলিয়া লক্ষ বাষ্প দিতেছ, তুমি বুঝি হরিদাস হইয়াছ ! নিশ্চয়ই বেটারা রাত্রিতে কারও ঘরে চুরি করিবার মতলব করিয়াছিস্, তাই দিনের বেলায় ‘কৃষ্ণ রাম হরি’ বলিয়া সাধুতার আবরণে নিঈদগিকে ঢাকিয়া রাখিয়া ধরা পড়ার হাত হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছিস্ ।”—কিন্তু এসকল বলার পর হইতেই—কেন বলিতে পারি না—আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার জিহ্বা হইতে অনবরত আপনা-আপনি “হরি হরি”—শব্দ বাহির হইতেছে ।

১৯১-১৯২ পরাবের অর্থ :—শ্লেচ্ছ কহিল—হিন্দুদিগকে পরিহাস করিয়া আমি ( বলিলাম )—( তোমরা ) কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, কেহ রামদাস, কেহবা হরিদাস ( হইয়াছ ) ! তাই সর্বদা “হরি হরি” বলিতেছ ! ( আমি ) জানি, ( নিশ্চয়ই তোমরা ) কাহারও ঘরে ধন চুরি করিবে ।

হরিনাম যে দ্বপ্রকাশ বস্তু, ১৯৩ পরাব হইতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে ।

১৯৪ । “পরিহাস”—স্থলে কোনও গ্রন্থে “মস্করা” পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ; অর্থ—ঠাট্টা, বিদ্রূপ ।

১৯৫ । বর্জন—বারণ । মন্ত্রোষধি ইত্যাদি—হিন্দুরা কোনও মন্ত্র প্রয়োগ করে, না কি ঔষধ প্রয়োগ করে বলিতে পারি না, যাহার ফলে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার জিহ্বা সর্বদা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে ।

পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিতে যবনের মুখেও শ্রীহরিনাম স্মরিত করাইয়াছেন ।

১৯৬ । মুসলমানদের কথা বলিয়া কয়েকজন কীর্তন-বিদ্রোহী হিন্দু, কীর্তনের বিরুদ্ধে কিরূপে কাজীর নিকটে নালিশ করিয়াছিল, তাহাই কাজী বলিতেছেন ।

তা-সভারে—১৮৬-১৯৫ পরাবোক্ত মুসলমানগণকে । পাষণ্ডি-হিন্দু—কীর্তন-বিদ্রোহী ভগবদ্বিহীন হিন্দু ।

১৯৭ । ভাঙ্গিল—নষ্ট করিল । প্রবর্তাইল—প্রবর্তিত করিল । যে কীর্তন ইত্যাদি—এইরূপ কীর্তনের কথা আমরা আর কখনও শুনি নাই । ব্যঙ্গনা এই যে, ইহা হিন্দুধর্মের অঙ্গমোদিত নহে ; এই কীর্তন চলিতে দিলে হিন্দুধর্ম নষ্ট হইবে ।

মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ ।  
তাতে বাণ নৃত্য গীত—যোগ্য আচরণ ॥ ১৯৮  
পূর্বের ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত ।  
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥ ১৯৯  
উচ্চ করি গায় গীত, দেয় করতালি ।  
মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥ ২০০  
না জানি কি খাঞা মন্ত হৈয়া নাচে গায় ।

হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥ ২০১  
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্তন ।  
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই—করি জাগরণ ॥ ২০২  
'নিমাই' নাম ছাড়ি এবে বোলায় 'গৌরহরি' ।  
হিন্দুধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥ ২০৩  
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ রাড়বাড় ।  
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ২০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৯৮ । পার্বণী হিন্দুদের মতে, হিন্দুধর্মের উপযোগী আচরণ কি, তাহা তাহারা কাজীকে জানাইতেছে । মঙ্গলচণ্ডী বা মনসার পূজা-উপলক্ষে নৃত্য-গীত-বাণ্যাদি-সহকারে রাত্রি-জাগরণই হিন্দু-ধর্মের অনুকূল আচরণ । বিষহরি—মনসাদেবী ; ইনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী ।

সর্পভয়-নিবারণের জন্ত লোকে মনসার পূজা করে ; আর সাংসারিক মঙ্গলের জন্ত মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা করে ; দুইটাই অনাশ্র-ধর্মের অঙ্গ—আত্মধর্ম বা ভগবদ্বিষয়ক ধর্মাচরণের অঙ্গীভূত ইহাদের একটীও নহে ।

১৯৯ । বিপরীত—উল্টা, ভাল-এর-উল্টা, মন্দ । চালায় বিপরীত—উল্টা বা অদ্ভুত আচরণ করে । গয়া হইতে আসার পর হইতেই নিমাই-পণ্ডিতের এসমস্ত অদ্ভুত আচরণ দেখা যাইতেছে ; তাহার পূর্বে কিন্তু সে ভালই ছিল—তখন কখনও তাহাকে কীর্তন-রূপ অনাচার করিতে দেখা যায় নাই । ( ইহা পাষণ্ডী হিন্দুদের কথা ) ।

২০০-২০১ । নিমাই পণ্ডিতের বিপরীত আচরণ কি, তাহা বলিতেছেন ২০০-২০১ পয়ারে । উচ্চ করি গায় গীত—চীৎকার করিয়া কীর্তন করে । দেয় করতালি—হাত তালি দেয় । মৃদঙ্গ করতাল ইত্যাদি—খোল-করতালের এমন অদ্ভুত শব্দ করে যে, তাতে কানে তাল লাগে—কর্ণ বধির হইয়া যায়, কান বালা পালা করে । না জানি ইত্যাদি—বোধ হয় ইহারা কোনও মাদক-দ্রব্য খাইয়া কীর্তন আরম্ভ করে, তাই উন্মত্তের গায় কখনও নাচে, কখনও গায়, কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, আবার কখনও বা ভূমিতে গড়াগড়ি যায় ।

বস্তুতঃ এই সমস্তই কৃষ্ণ-প্রেমের বহির্লক্ষণ । “এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্য জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ । হসত্যথো রোদিতি রোতি গায়ত্যান্মাদবল্ল্যতি লোকবাহঃ ॥ শ্রীভা, ১১।২।৪০ ॥”

১০২ । পাষণ্ডিগণ আরও বলিল—সর্বদাই এই সঙ্কীর্তনের কোলাহলে লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—রাত্রিতে কেহ ঘুমাতে পারে না ; তাতে বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া সকলেরই পাগল হওয়ার যোগাড় হইয়াছে ।”

২০৩ । পাষণ্ডিগণ আরও বলিল :—পূর্বে ইহার নাম ছিল নিমাই, কিন্তু এখন বোধ হয় সেই নামে তিনি সন্তুষ্ট নহেন ; এখন আবার নিজের “গৌরহরি”-নাম প্রচার করিতেছেন । বস্তুতঃ নিমাই-পণ্ডিত পাষণ্ড-মত এবং পাষণ্ডের আচরণ প্রচার করিয়া হিন্দুধর্মটাকে নষ্ট করিয়া দিতেছে । পাষণ্ড-সঞ্চারি—পাষণ্ড ( হিন্দুধর্মবিরোধী ) মত ও আচরণ প্রচার করিয়া ।

২০৪ । নীচ—নীচজাতীয় লোকগণ । রাড়বাড়—অতর্কজ ; যাহারা ভালমন্দ তত্ত্বাদি কিছুই জানে না । কৃষ্ণের কীর্তন ইত্যাদি—যাহারা ভালমন্দ বিচার করিতে পারে না, কোনও রূপ তত্ত্বাদি জানেনা, এরূপ নীচজাতীয় লোকগণই কৃষ্ণের কীর্তন করিয়া থাকে ; কোনও বিজ্ঞ বা সম্ভ্রান্ত লোক কখনও কৃষ্ণকীর্তন করে না । এই পাপে—যে কীর্তন কেবল অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর লোকেরই কাজ, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকের পক্ষে সেই কৃষ্ণকীর্তন করার পাপে । উজাড়—ধ্বংস ; মড়ক হইবে, তাতে সমস্ত লোক মরিয়া যাইবে ।

অথবা কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রতুল্য পবিত্র, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসজ্জনেরই কৃষ্ণনাম কীর্তনে অধিকার ; অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর

হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জানি ।

গ্রামের ঠাকুর তুমি, সবে তোমার জন ।

সর্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীৰ্য্য হয় হানি ॥ ২০৫

নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন ॥ ২০৬

গোর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

লোকের তাহাতে অধিকার নাই । নিমাই-পণ্ডিত এই অনধিকারী নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারা কৃষ্ণকীৰ্ত্তন করাইয়া পাপের কার্য্য করিতেছেন । তাহার এই পাপকার্য্যের ফলে সমস্ত নবদ্বীপের অমঙ্গল হইবে ।

অভিযোগকারীদের উক্তি বিচারসহ নহে । ধনী, নিধন, উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ—সকলেরই কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে অধিকার আছে ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়ে নবদ্বীপের হিন্দুধর্মের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, কীৰ্ত্তন-বিদ্বেষী হিন্দুদের কথা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য, শ্রীবাস, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রায় কেহই হরিনাম-কীৰ্ত্তনাদি করিতনা—করাও তাহারা বোধ হয় তাহাদের মর্যাদার হানিজনক বলিয়া মনে করিত । তবে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কীৰ্ত্তনের কিছু প্রচলন ছিল ; কিন্তু তাহারা ধর্মের তদ্বাদি সঙ্কে নিতান্ত অজ্ঞ ছিল ( ২০৪ পয়ারে ) । মঙ্গল-চণ্ডীর গীত, মনসার গান এবং তদুপলক্ষে জাগরণ—ইহাই ছিল সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের একমাত্র ধর্মাচরণ ( ১৯৮ পয়ার ) ; মোটামোটি অবস্থা ছিল এই যে, ভগবদ্বিসয়ক ধর্মের অনুষ্ঠান নবদ্বীপ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলেও বোধ হয় অতুক্তি হইবে না ।

২০৫। উচ্চ-নামকীৰ্ত্তনের দোষ-সঙ্কে বহির্গত হিন্দুগণ কাজীর নিকট বলিল—“হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরের নামই মহামন্ত্র ; মহামন্ত্র অতি-গোপনে জপ করিতে হয় ; অগ্রে শুনিলে মন্ত্রের শক্তি কার্য্যকরী হয় না । আর এই নিমাই-পণ্ডিত বহুলোক সঙ্কে করিয়া মহামন্ত্র-রূপ নাম উচ্চস্বরে কীৰ্ত্তন করিয়া নগরে নগরে ভ্রমণ করে ; তাতে সকলেরই কর্ণগোচর হওয়ায় নামের শক্তি আর কার্য্যকরী হয় না—তাহাদের চীৎকার লোকের অশান্তি উৎপাদন ব্যতীত আর কোনও ফলই প্রসব করে না ।”

অভিযোগকারীদের এই উক্তিও বিচারসহ নহে । দীক্ষামন্ত্রই গোপনে জপ করিতে হয় ; দীক্ষামন্ত্র অগ্রে শুনিলে তাহার শক্তি কার্য্যকরী হয় না । কিন্তু শ্রীনাম মহামন্ত্র হইলেও সকলভাবেই কীৰ্ত্তনীয় । শ্রীলহরিদাসঠাকুর এক লক্ষ নাম উচ্চস্বরে নিত্য কীৰ্ত্তন করিতেন ; শ্রীমন্ মহাপ্রভুও উচ্চস্বরে নাম কীৰ্ত্তন করিতেন এবং উচ্চসকীৰ্ত্তন প্রচার করিয়া গিয়াছেন ( ৩৩৬৪ ) । শ্রীমদভাগবতের “শ্রবণং কীৰ্ত্তনং” ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“নামকীৰ্ত্তনঞ্চৈবমুচ্চরেব প্রশস্তম্—নামকীৰ্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত ।” শাস্ত্রে নামশ্রবণের অনেক মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে ; উচ্চৈঃস্বরে নামকীৰ্ত্তন নিষিদ্ধ হইলে শ্রবণের কথাই উঠিতে পারে না । নামী শ্রীভগবান পরম-স্বতন্ত্র-তত্ত্ব ; নাম ও নামীতে অভেদবশতঃ নামও স্বতন্ত্রতত্ত্ব । স্বরূপরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও নামকে “স্বতন্ত্রতত্ত্ব” বলিয়াছেন । “কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্মাম কামিতকামদম্ ॥ ১১২০৪ ॥” স্বতন্ত্র ভগবান্ যেমন কোনও বিধিনিষেধের অধীন নহেন, স্বতন্ত্র বলিয়া তাঁহার নামও কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন ; তাই শ্রীনাম দীক্ষা, পুরশ্চর্যা, সদাচার, দেশ-কাল প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না । “আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং স্মমহতামুচ্চাটনং চাংহসামা-চণ্ডালমমূলোকশূলভো বশ্চ মুক্তিপ্রিয়ঃ । নো দীক্ষাং ন চ সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগেব কলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ শ্রী, চৈ, চ ২।১৫।২ ধৃত পদ্মাবলীবচনম্ ॥” দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে । জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে ॥ ২।১৫।১০২ ॥ থাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় । দেশকাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥ ৩২০।১৪ ॥ ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা । নোচ্ছিষ্টাদৌ নিবেদ্যচ হরেন্নামনি লুদ্ধক ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০। ২০২ ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তরবচনম্ ॥ অভিধেয় সাধনভক্তির গুণহ বিচার । সর্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥ ২।২৫।২২ ॥

২০৬। ১৯৭-২০৫ পয়ারে কীৰ্ত্তনবিদ্বেষী হিন্দুগণ কীৰ্ত্তন সঙ্কে তাহাদের আপত্তির কারণ জানাইয়া এক্ষণে কাজীর নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিতেছে ।



তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সভারে— ।

সভে ঘর যাহ, আমি নিবেধিব তায়ে ॥ ২০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

গ্রামের ঠাকুর—নবদ্বীপের শাসন-কর্ত্তা । সভে তোমার জন—নবদ্বীপবাসী সকলেই তোমার শাসনাধীন প্রজা । নিমাই বোলাইয়া—নিমাই-পণ্ডিতকে ডাকাইয়া । করহ বর্জন—কীর্তন করিতে নিষেধ কর ।

কাজীর উক্তি হইতে একটি কথা স্ভাবতঃই মনে উদ্ভূত হয় ; তাহা হইতেছে এই । মুসলমানদের মধ্যে যাহারা কীর্তনের বিদ্বেষী ছিল, বা কীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই কোনও না কোনও প্রকারে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছে । স্বয়ং কাজী—মুদঙ্গ ভাঙ্গিয়া কীর্তন করিলে সর্ব্বদা দণ্ড করিয়া জাতি লওয়ার ধমক দিয়া থাকিলেও নৃসিংহদেবের কৃপা পাইলেন ; কাজীর পাইক-পেয়াদা কীর্তন-নিবেধ করিতে যাইয়া অলৌকিক অগ্নি-উল্কার দাড়ী পোড়া যাওয়ায় মুখে ক্ষত লইয়া গৃহে ফিরিল ; যাহারা কীর্তনকারীগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সকলের জিহ্বাতেই আপনা-আপনি হরি-কৃষ্ণনাম, তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ফুরিত হইতে লাগিল—সাধকের পক্ষে যাহা বহু-সাধনায়ও পাওয়া দুষ্কর, তাহা তাহারা—যাহারা হরি-কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়াই স্বীকার করেনা, হরি-কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষমাত্রই পোষণ করে, তাহারা—কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের বলে পাইয়া ফেলিল । আর যাহারা হিন্দু, যাহাদের শাস্ত্র হরিকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া কীর্তন করে, তাহাদের মধ্যে যাহারা কীর্তনের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছিল, তাহাদের জিহ্বায় আপনা-আপনি হরিনামের অভ্যুদয়ের কথা, নৃসিংহ কর্তৃক তাহাদের কাহারও বক্ষঃ বিদীর্ণ হওয়ার কথা, কিম্বা অগ্নি-উল্কার কাহারও মুখ-দাহরূপ শাস্তি-কৃপার কথা শুনা যায় না । ইহার কারণ কি ? ভগবানের লীলার অভিপ্রায় ভগবান্ই জানেন, আর জানেন তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ; আমাদের ত্রায় বহির্গুণ লোকের পক্ষে তাহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র ; তথাপি, যে ছোট্ট একটি কথা চিত্তে উদ্ভূত হইতেছে, ভক্ত-পাঠকগণের বিবেচনার নিমিত্ত এস্থলে উল্লেখ করিতেছি । প্রথমতঃ মুসলমানদের মধ্যে যাহারা কোনও না কোনও ভাবে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছে, তাহারা জাতিগত-ভাবে হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী না হইলেও সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত ভাবে কীর্তনের বিরোধী ছিলনা, অন্তরের সহিত কীর্তনের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিত না ; কাজী ও তাঁহার পেয়াদাগণ সম্ভবতঃ তাহাদের কণ্ঠের অনুরোধে, বাদশাহের অপ্রীতির আশঙ্কায় কীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং অত্যাচার মুসলমানগণ সম্ভবতঃ তাহাদের জাতিগত সংস্কার বশতঃ, কিম্বা স্ভাব-স্বলভ কৌতুক-চপলতা বশতঃ কীর্তনকারীদেরকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়াছিল ; তাহাদের অন্তরে বাস্তবিক কোনও বিদ্বেষ না থাকায় তাহাদের গুরুতর অপরাধ হয় নাই এবং ভাবী গুরুতর অপরাধ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শ্রীনৃসিংহরূপে বা উল্কা-অগ্নিরূপে পরম-করণ শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন । বিশেষতঃ যাহারা হরি-রাম-কৃষ্ণ বলিয়া হিন্দুদিগকে ঠাট্টা করিয়াছিল, হেলায়-ঠাট্টায় নামগ্রহণ করাতেও পরমকরণ-ভুবনমঙ্গল-শ্রীহরিনাম তাহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে—আপনা-আপনিই তাহাদের জিহ্বায় নৃত্য করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন । আর, হিন্দুদের মধ্যে যাহারা কাজীর নিকটে উপনীত হইয়া কীর্তনকারীদের নামে নালিশ করিয়াছিল, তাহারা সম্ভবতঃ অন্তরের সহিতই কীর্তনের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিত ; এই গুরুতর অপরাধেই তাহারা শ্রীভগবানের ও শ্রীনামের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, কীর্তনের বিরুদ্ধাচরণকারী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সকলের মনের অবস্থা একরূপই ছিল বলিয়া—সকলেই সমভাবে নিষ্পাপি অথবা সমপরিমাণ পাপী ছিল বলিয়া—মনে করিলেও ইহার একটি সমাধান পাওয়া যায় । শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবার নাম প্রচার করিতে আসিয়াছেন ; নাম-প্রচারের নিমিত্ত নামের মহিমা প্রকটন বিশেষ প্রয়োজনীয় । শ্রীহরিনাম যে কেহ ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে পারেনা, নাম যে স্বপ্রকাশ বস্তু, নাম কৃপা করিয়া স্বয়ং যাহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়, কেবল তিনিই যে নামকীর্তন করিতে পারেন—তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, নাম যে তাঁহার জিহ্বায় উচ্চারিত হইতে থাকে—নামের এই অন্তত ও অলৌকিক মহিমাটী জনসমাজে যদি প্রচারিত হয়, তাহা

হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ ।

সেই তুমি হও, হেন লয় মোর মন ॥ ২০৮

এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া-হাসিয়া ।

কহিতে লাগিল কিছু কাজীয়ে ছুঁইয়া—২০৯

তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—এ বড় বিচিত্র ।

পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম-পবিত্র ॥ ২১০

‘হরি কৃষ্ণ নারায়ণ’ লৈলে তিন নাম ।

বড় ভাগ্যবান তুমি বড় পুণ্যবান ॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

হইলে লোক সম্ভাবতঃই নামের প্রতি ঈর্ষ্যাবান হইতে পারে। ভগবন্নাম-কীর্তন করা হিন্দুর ধর্ম; সুতরাং কোনও ধর্মদ্রোহী হিন্দুর জিহ্বায়ও যদি হরিনাম আপনা-আপনি—তাহার অনিচ্ছায়—স্বরিত হয়, তাহা হইলেও যাহারা নামের মহিমা জানেনা, তাহারা নামের স্বতঃস্ফূর্তে সন্দেহ পোষণ করিতে পারে—ধর্মদ্রোহী হইলেও সেই হিন্দু জাতিগত সংস্কার-বশতঃ নাম উচ্চারণ করিতেছে বলিয়া সন্দেহ কবিত্তে পারে। কিন্তু যাহারা হিন্দুধর্মের বিরোধী, হরি-রাম-কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করাকে যাহারা নিজেদের ধর্মের হানিকর বলিয়াই মনে করে—সেই মুসলমানদের মধ্যে যদি কেহ—কোনও হিন্দুর কাছে নয়, স্বয়ং কাজীর নিকটে, যিনি স্বধর্মের বিরুদ্ধাচরণের নিমিত্ত তাহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে পারেন—হরিদাস-ঠাকুরের গ্রাম বাইশ-বাজারে নিয়া বেত্রাঘাতে অর্জ্জরিত করিতে পারেন, সেই কাজীর নিকটে যাইয়া মুসলমানদের কেহ যদি—নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও হরি-কৃষ্ণ-রাম-শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে কেহই সম্ভবতঃ তাহার উপরে কপটতার আরোপ করিবে না; দণ্ডদাতা-স্বয়ং-কাজীর নিকটে যাইয়া সেই লোক স্বীয় ধর্মের প্রতিকূল আচরণদ্বারা ইচ্ছাপূর্বক বাচালতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিবে না—হরিনাম স্বয়ংই তাহার জিহ্বায় নৃত্য করিতেছেন, ইহাই লোকে বিশ্বাস করিবে। এই ভাবে শ্রীভগবন্নামের স্বপ্রকাশতা প্রকটিত করার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু সমভাবাপন্ন হিন্দুর পরিবর্তে মুসলমানের জিহ্বায় ঐ নাম স্বরিত করিয়াছেন। আর নৃসিংহরূপে কাজীকে কৃপা করিয়া এবং অগ্নি-উল্কারূপে কাজীর পেয়াদাকে কৃপা করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু দেখাইলেন যে, ভগবান্ স্বরূপ-প্রকাশে জাতিকুলের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার নিকটে সকলেই সমান। হিন্দু যবনকে সামাজিকভাবে দূরে সরাইয়া রাখিলেও শ্রীভগবান্ তাহাকে দূরে রাখেন না, কোনওরূপে তাঁহার সংশ্রবে আসিলেই তিনি তাহাকে স্বীয় কৃপাধারা অন্তঃকরণের যোগাতা দান করেন।

২০৮। অর্থঃ—কাজী প্রভুকে বলিলেন—“আমার মনে হয়, হিন্দুর বড় ঈশ্বর যে নারায়ণ, তুমি সেই নারায়ণ।” বড় ঈশ্বর—পরমেশ্বর; স্বয়ং ভগবান্। মহাপ্রভুর কৃপায় কাজী প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

২০৯। ছুঁইয়া—স্পর্শ করিয়া। স্পর্শ দ্বারা প্রভু বোধ হয় কাজীর চিতে বিশেষ কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিলেন।

২১০-২১১। এই দুই পয়ার কাজীর প্রতি প্রভুর উক্তি। প্রভু বলিলেন—“কাজী, তুমি নিজে মুসলমান, মুসলমান বাদসাহের প্রতিনিধি, নবদ্বীপ-নগরে তুমিই মুসলমান-ধর্মের রক্ষাকর্তা; এরূপ অবস্থায় তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—ইহা বস্তুতঃই অদ্ভুত ব্যাপার! যাহাইউক, কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাতে তোমার পাপ ক্ষয় হইল, চিত্ত পবিত্র হইল। তুমি—‘হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ’—ভগবানের এই তিনটি নামই গ্রহণ করিয়াছ; কাজী, তুমি বড়ই ভাগ্যবান।”

১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ২০৩ পয়ারে “হরি,” ১৮৭, ১৯১, ১৯৫, ২০৪ পয়ারে “কৃষ্ণ” এবং ২০৮ পয়ারে “নারায়ণ” শব্দ কাজীর মুখ হইতে বাহির হইয়াছে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের নাম করার উদ্দেশ্যে কাজী “হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ”-শব্দ উচ্চারণ করেন নাই; প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি এই তিনটি শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন; তাহাতে কিরূপে তাঁহার পাপক্ষয় হইল? উত্তর—ইহা নামের বস্তুগত শক্তি; বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখে না; অগ্নির দাহিকাশক্তির কথা না জানিয়াও যদি কেহ আগুনে হাত দেয়, তাহা হইলেও তাহার হাত পুড়িয়া যাইবে, আগুনের শক্তি স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিবেই। ভগবন্নামও এই

এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী।  
 প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয়বাণী—২১২  
 তোমার প্রসাদে মোর যুচিল কুমতি।  
 এই কৃপা কর যে—তোমাতে রহু ভক্তি ২১৩ ॥  
 প্রভু কহে—এক দান মাগিহে তোমায।  
 সঙ্কীৰ্তনবাদ যৈছে না হয় নদীয়ায় ॥ ২১৪  
 কাজী কহে—মোর বংশে যত উপজিবে।  
 তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে ॥ ২১৫  
 শুনি প্রভু “হরি” বলি উঠিলা আপনি।  
 উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরিক্ষনি ॥ ২১৬  
 কীর্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।

সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লাসিতমন ॥ ২১৭  
 কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।  
 নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন ॥ ২১৮  
 এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।  
 ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥ ২১৯  
 একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।  
 নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥ ২২০  
 শ্রীবাসপুত্রের তাই হৈল পরলোক।  
 তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥ ২২১  
 মৃতপুত্রমুখে কৈল জ্ঞানের কথন।  
 আপনে দুইভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন ॥ ২২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবে নাম-গ্রহণকারীর বুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া স্থায়ী শক্তি প্রকাশ করিয়া তাহার পাপ ধ্বংস করে, তাহার চিত্ত পবিত্র করে। তাই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলিয়াছেন, হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম উচ্চারণ করিলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। “শ্রদ্ধা হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ। তেযাং নাম সদা পার্থ বর্ততে মম হৃদয়ে ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অজ্ঞান! শ্রদ্ধা বা হেলা ক্রমেও যাহারা আমার নাম উচ্চারণ করে, আমার হৃদয়ে তাহাদের নাম জাগরিত থাকে। ১১।২৪৫॥” হরিভক্তিবিলাস আরও বলেন—“সকৃদুচ্চারণন্ত্যেব হরেনাম চিদাত্মকম্। ফলং নাশ্র ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ ॥—চিদাত্মক হরিনাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে যে ফল হয়, চতুর্গুণ বিধাতা এবং সহস্র-বদন অনন্তও সে ফলবর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। ১১।২৪২॥”

২১২। দুই চক্ষে পড়ে পানী—ভগবান্নাম উচ্চারণের ফলে কাজীর চিত্তে প্রেমের উদয় হইয়াছে; তাই তাহার নয়নে অশ্রুরূপ সাত্ত্বিকভাবের বিকার প্রকটিত হইয়াছে। পানী—পানীয়; জল।

২১৩। ভক্তি-রাগী হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিলে আপনা-আপনিই দৈন্ত আসিয়া পড়ে, তখন সর্বোত্তম হইয়াও ভক্ত নিজেকে সকলের অধম বলিয়া মনে করেন। তাই আজ নবদ্বীপের শাসনকর্তা কাজী, লৌকিক হিসাবে তাহার একজন প্রজা শ্রীনিমাই-পণ্ডিতের—যিনি কাজী অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট এবং যিনি মুসলমান-ধর্মের বিরোধী হিন্দুধর্মাবলম্বী, সেই শ্রীনিমাই-পণ্ডিতের—চরণ স্পর্শ করিয়া ভক্তি যাচঞা করিতেছেন।

২১৪। এক দান—একটি ভিক্ষা। সঙ্কীৰ্তনবাদ—সঙ্কীৰ্তনের বাধা বা বিঘ্ন। যৈছে—যেন।

২১৫। তালাক—শপথ। কাজী বলিলেন, “আমার বংশধরদিগকে শপথ দিয়া যাইব, তাহার যেন কখনও সঙ্কীৰ্তনে বাধা না দেয়।”

২১৭। কীর্তন করিতে—সঙ্কীৰ্তন করিতে করিতে। সঙ্গে চলি ইত্যাদি—কাজীও কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতদূর পর্যন্ত গেলেন।

২১৯। প্রসাদ—কৃপা। ইহা—কাজীর প্রতি কৃপার কথা।

২২০-২২২। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে এক সময়ে শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে কথা বলাইয়াছিলেন, সেই লীলার কথা বলিতেছেন ২২০-২২২ পয়ায়ে।

নিত্যানন্দ সঙ্গে—নিত্যানন্দ সহ। দুইভাই—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীবাস-পুত্রের—শ্রীবাসের পুত্রের। হৈল পরলোক—মৃত্যু হইল। কৈল—কহাইল। জ্ঞানের কথন—কে কার পিতা, কে কার পুত্র

তবে ত করিল সব ভক্তে বরদান ।  
 উচ্ছ্রিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥ ২২৩  
 শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন ।  
 প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন ॥ ২২৪  
 ‘দেখিনু দেখিনু’ বলি হইল পাগল ।  
 প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব আগল ॥ ২২৫  
 আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশিকা মাগিল ।

শ্রীবাস কহে—গোপীগণ বংশী হরি নিল ॥ ২২৬  
 শুনি প্রভু ‘বোল বোল’ কহেন আবেশে ।  
 শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলা-রসে ॥ ২২৭  
 প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল ।  
 শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ ২২৮  
 তবে ‘বোল বোল’ প্রভু বোলে বারবার ।  
 পুনঃপুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥ ২২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ইত্যাদি তত্ত্ব-কথা । আপনে দুইভাই ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসকে বলিলেন—“আমাদিগকে তুমি তোমার পুত্র বলিয়া মনে কর ।”

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যখন শ্রীবাসের অঙ্গনে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন শ্রীবাসের শিশু-পুত্রের মৃত্যু হয় । কিন্তু প্রভুর আনন্দ ভঙ্গ হইবে বলিয়া শ্রীবাস মৃত-পুত্রের জন্ত বিন্দুমাত্রও দুঃখ বা শোক প্রকাশ করিলেন না এবং বাড়ীর কাহাকেও শোক প্রকাশ করিতে দিলেন না । কলতঃ তাহার যে পুত্র-বিয়োগ হইয়াছে, ইহা বাড়ীর কাহারও ব্যবহারেই প্রকাশ পাইল না । কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রভু যখন এ সংবাদ জানিলেন, তখন মৃত-বালকের মুখ দিয়া মহাপ্রভু এই কথা বলাইলেন—“কে কার পিতা ? কে কার পুত্র ? ইত্যাদি-” ইহাই জানের কথা । তারপর শ্রীবাসকে প্রভু বলিলেন—“আমি নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার । চিত্তে কিছু তুমি ব্যথা না ভাবিহ আর ॥” শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড ২৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

২২৩ । শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময় প্রভু সমস্ত ভক্তকে বর দান করিয়াছিলেন । নারায়ণী—শ্রীবাস-পণ্ডিতের ভ্রাতৃপুত্রী ; ইনি শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের জননী । ইনি ব্রজলীলায় ছিলেন অম্বিকার ভগিনী কিলিঙ্গা—যিনি সর্বদা কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-ভোজনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন । নারায়ণীর বয়স যখন চারি বৎসর, তখন প্রভুর আদেশে ইনি “হা কৃষ্ণ” বলিয়া ভূপতিত হইলেন, অশ্রু ও স্বেদে ধরণী সিক্ত হইয়া গেল । ( শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩ ) প্রভুর মহাপ্রকাশের সময়ে প্রভুর চর্কিত-তাম্বুল সেবন করার জন্ত প্রভু সকলকে আদেশ করিলে “মহানন্দে থায় সতে হরষিত হৈয়া । কোটিচান্দ-শারদ-মুখের দ্রব্য পায়্যা ॥ ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল । নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥ শ্রীবাসের ভ্রাতৃত্বতা বালিকা অজ্ঞান । তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান ॥” শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ ।

২২৪ । সিঁয়ে—সিলাই করে । দরজী যবন—মুসলমান দরজী । পাগল—প্রেমে উন্মত্ত । আগল—অগ্রগণ্য । বৈষ্ণব আগল—বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

২২৬ । আবেশে—ব্রজভাবে আবেশে, শ্রীকৃষ্ণরূপে । বংশিকা—বাঁশী । প্রভু শ্রীবাসের নিকটে বাঁশী চাহিলেন । শ্রীবাসও চতুরতা করিয়া রসপুষ্টির নিমিত্ত বলিলেন—“তোমার বাঁশী গোপিকারা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ।”

২২৭ । আবেশে—বংশী-চুরি-লীলার আবেশে । বৃন্দাবনলীলা রসে—রসময়-বৃন্দাবনলীলা । কোন্ লীলা বর্ণন করিলেন, পরবর্তী ২২৮-২৩২ পয়ায়ে তাহার দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইয়াছে ।

২২৮ । শ্রীবাস প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্য বর্ণন করিলেন ।

২২৯ । করিয়া বিস্তার—বৃন্দাবন-মাধুর্য্য এবং পরবর্তী-পয়ায়ে বর্ণিত লীলাসমূহ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিলেন ।

বংশীবাজে গোপীগণের বনে আকর্ষণ ।  
 তা-সভার সঙ্গে যৈছে বনবিহরণ ॥ ২৩০  
 তাহি-মধ্যে ছয়খতু লীলার বর্ণন ।  
 মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কখন ॥ ২৩১  
 'বোল বোল' বোলে প্রভু শুনিতে উল্লাস ।  
 শ্রীবাস কহে তবে রাসরসের বিলাস ॥ ২৩২

কহিতে শুনিতে এঁছে প্রাতঃকাল হৈল ।  
 প্রভু শ্রীবাসেরে তুষি আলিঙ্গন কৈল ॥ ২৩৩  
 তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা ।  
 রুক্মিণীস্বরূপ প্রভু আপনে হইলা ॥ ২৩৪  
 কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি ।  
 খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি ॥ ২৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২৩০-৩১ । শরৎ-পূর্ণিমা-রজনীতে শারদীয়-মহারাস-লীলা একটনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া যখন বংশীবাদন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপবধূগণের চিত্ত ক্রীড়িত বিচলিত হইয়াছিল, যিনি যে কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই কাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্যস্ততাবশতঃ কেহ কেহ বিপর্য্যস্তভাবে বেশভূষা করিয়াও তাঁহারা কি ভাবে বনের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ক্রীড়িত চতুরতাগর বাক্যে তাঁহাদের প্রেম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, পরে ক্রীড়িত তাঁহাদের সহিত বনবিহার করিয়াছিলেন, বনভ্রমণকালে, গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ছয়খতুর ভাবপূর্ণ বনসমূহে কিভাবে তিনি গোপীদের সঙ্গে লীলা করিয়াছিলেন, কিভাবে মধুপান-লীলা এবং জল-কেলি-লীলা অল্পকাল হইয়াছিল—প্রভুর প্রীতির নিমিত্ত শ্রীবাস তৎসমস্তই বর্ণনা করিলেন ।

**বনবিহরণ**—বনে বিহার । **তাহি মধ্যে**—বনবিহারের মধ্যে । **ছয়খতু লীলা**—শ্রীবৃন্দাবনের অন্তর্গত ছয়টি বনে গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ছয়টি ঋতুর অবস্থা—এক বনে গ্রীষ্ম ঋতু, এক বনে বর্ষা-ঋতু, এক বনে শরত ঋতু ইত্যাদি ক্রমে ছয়টি বনে ছয়টি ঋতুর অবস্থা—নিত্য বিরাজিত ; এতদতিরিক্ত আরও একটি বন আছে, যেখানে ছয়টি ঋতুই যুগপৎ দর্শমান । ব্রজবধূদের সহিত বনবিহার-কালে শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বনেও বিহার করিয়াছিলেন ।

২৩৩ । **প্রাতঃকাল হৈল**—সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল । **প্রভু শ্রীবাসেরে** ইত্যাদি—লীলাকথা দ্বারা প্রভুর আনন্দ বর্ধন করিয়াছেন বলিয়া প্রভু শ্রীবাসের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, শ্রীবাসও তাহাতে তুষ্ট হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন । **তুষি আলিঙ্গন কৈল**—তুষ্ট করিয়া ( তুষি—তুষিয়া ) আলিঙ্গন করিলেন ; অর্থাৎ আলিঙ্গন করিয়া তুষ্ট ( বা কৃতার্থ ) করিলেন । কোনও জিনিস মাটিতে পড়িয়া তারপর “ধূপ্” শব্দ করিলেও যেমন সাধারণতঃ বলা হয় “ধূপ্ করিয়া পড়িল”, তদ্রূপ বস্তুতঃ আলিঙ্গন দ্বারা তুষ্ট করিয়া থাকিলেও এস্থলে “তুষি ( তুষ্ট করিয়া ) আলিঙ্গন করিলেন” বলা হইল ।

২৩৪ । **আচার্য্যের ঘরে**—চন্দ্রশেখর-আচার্য্যের গৃহে । **কৈল কৃষ্ণলীলা**—প্রভু কৃষ্ণ-লীলার অভিনয় করিলেন । তাহাতে প্রভু নিজে রুক্মিণী দেবীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন—তিনিই রুক্মিণী সাজিয়াছিলেন ।

২৩৫ । রুক্মিণী সাজার পরে প্রভু কখনও বা দুর্গার ভাবে এবং কখনও বা লক্ষ্মীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া দুর্গা ও লক্ষ্মীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন । **চিচ্ছক্তি**—ভগবানের অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তিকে চিচ্ছক্তিবলে ; রুক্মিণী, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি তাঁহারই চিচ্ছক্তির বিভিন্ন বিলাস-বৈচিত্রী ।

**খাটে বসি** ইত্যাদি—অভিনয়-উপলক্ষে প্রভু এক সময় মহালক্ষ্মীভাবে আবিষ্ট হইয়া খাটের উপরে বসিয়া তাঁহার স্তব পড়ার জন্ত ভক্তগণকে আদেশ করিলে তাঁহারা সকলে মাতৃভাবে আবেশ জানিয়া স্ব-স্ব-কৃতি অনুসারে কেহ লক্ষ্মীস্তব, কেহ চণ্ডীস্তবাদি পাঠ করিতে লাগিলেন । হঠাৎ রাত্রিশেষ দেখিয়া মাতৃবিরহ-বেদনার আশঙ্কায় সকলে বিচলিত হইয়া পড়িলে “মাতৃভাবে বিশ্বস্তর সভারে ধরিয়া । স্তনপান করায় পরম শিখ হৈয়া ॥ ঐ স্তন পানে সত্য বিরহ গেল দূর । প্রেমরসে সতে মত্ত হইলা প্রচুর ॥” প্রভু এইরূপে সকলকে প্রেমভক্তি দান করিলেন । **শ্রী-চৈঃ ভাঃ মধ্য । ১৮ ॥**



একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে ।  
 এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে ॥ ২৩৬  
 চরণের ধূলি সেই লয় বারবার ।  
 দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥ ২৩৭  
 সেইক্ষণে ধাত্রী প্রভু গঙ্গাতে পড়িল ।  
 নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইল ॥ ২৩৮  
 বিজয় আচার্য্যগৃহে সে রাত্রি রহিল ।  
 প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লৈয়া গেল ॥ ২৩৯  
 একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া ।  
 ‘গোপী গোপী’ নাম লয় বিষম হইয়া ॥ ২৪০  
 এক পটুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে ।  
 ‘গোপী গোপী’ নাম শুনি লাগিল কহিতে—॥২৪১  
 ‘কৃষ্ণনাম’ কেনে না লও ? কৃষ্ণনাম ধন্য ।  
 ‘গোপী গোপী’ বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য ॥ ২৪২

শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার ।  
 ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিল প্রভু পটুয়া মারিবার ॥ ২৪৩  
 ভয়ে পালায় পটুয়া, পাছে পাছে প্রভু ধায় ।  
 আস্তেবাস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥ ২৪৪  
 প্রভুরে শাস্ত করি আনিল নিজঘরে ।  
 পটুয়া পলাঞা গেল পটুয়া-সভারে ॥ ২৪৫  
 পটুয়া সহস্র যাই পড়ে একটাই ।  
 প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহা যাই ॥ ২৪৬  
 শুনি ক্রুদ্ধ হৈল সব পটুয়ার গণ ।  
 সবে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন—॥২৪৭  
 সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই ।  
 ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাই ॥ ২৪৮  
 পুন যদি ঐছে করে, মারিব তাহারে ।  
 কোন বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে ? ॥ ২৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টকা ।

২৩৬-৩৯ । নৃত্য-অবসানে—শ্রীবাস-অঙ্গনে নৃত্যকীর্তনের পরে । চরণে—প্রভুর চরণে । দুঃখ হইল—  
 পরস্পর স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া প্রভুর দুঃখ হইল । গঙ্গাতে পড়িল—পরস্পর-স্পর্শজনিত পাপ দূর করার উদ্দেশ্যে ।  
 যন্ততঃ, কোনও পাপই প্রভুকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না ; তথাপি, জীলোক-বিষয়ে লোকদিগকে সতর্কতা শিক্ষা  
 দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রভু এইরূপ আচরণ করিলেন । ঘরে লৈয়া গেল—প্রভুকে গৃহে লইয়া গেলেন ।

২৪০-৪৩ । গোপীভাবে—ব্রজগোপীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া । বিষম হইয়া—দুঃখিত হইয়া । পটুয়া—  
 বিজ্ঞার্থী ; ছাত্র । দোষোদ্গার—পুতনাবধাদি-দোষের কীর্তন ।

গোপীগণ মন প্রাণ দেহ কুলধর্ম্ম দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তথাপি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া  
 মথুরাদি স্থানে যাইয়া তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতেন । এ সব বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গোপীদিগের কামগন্ধহীন  
 প্রেমের প্রতি মহাপ্রভুর আত্যন্তিক মহাহুভূতি ও শ্রীকৃষ্ণের নির্ভূততার প্রতি ক্রোধ জন্মাতে, তিনি গোপীভাবে আবিষ্ট  
 হইয়া গোপী গোপী জপ করিতেছিলেন ; এমন সময় এক পটুয়া আসিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করিল, তখন গোপী-  
 ভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিলেন, এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের লোক আসিয়া তাঁহাকে গোপীদিগের পক্ষ ত্যাগ করিয়া  
 শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাবলম্বন করার জন্ত অহুরোধ করিতেছে । ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রভুর ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইল ;  
 তাই তিনি বলিতে লাগিলেন, “তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ পুতনাদি-বধ করিয়া জীহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইয়াছেন,  
 বৃষাসুরাদিকে বধ করিয়া গোহত্যা-জনিত পাপ অর্জন করিয়াছেন ; তোমাদের শ্রীকৃষ্ণের দয়া নাই, তিনি অত্যন্ত নির্ভূর ।  
 এইরূপ নির্ভূরের নাম করার জন্ত তুমি আনাকে অহুরোধ করিতেছ ?” এই বলিয়া মহাক্রোধে ভাবাবিষ্ট প্রভু  
 পটুয়াকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে গেলেন । বলা বাহুল্য, এই সময়ে প্রভুর বাহুজ্ঞান ছিল না । শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য । ২৫ ।

২৪৪-৪৬ । রহায়—খামায় । পটুয়া-সভারে—পটুয়াদিগের সভায় ; যেখানে সমস্ত পটুয়াগণ একত্র  
 হইয়াছে, সেই স্থানে । প্রভুর বৃত্তান্ত—প্রভু যে ঠেঙ্গা লইয়া তাহাকে মারিতে আসিয়াছে, সেই কথা । দ্বিজ—  
 প্রভু যাহাকে ঠেঙ্গা লইয়া তাড়াইয়াছিলেন, সেই পটুয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান ।

২৪৭ । প্রভুর নিন্দন—কি বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা ২৪৮-৪৯ পয়ায়ে বলা হইয়াছে ।

প্রভুর নিন্দায় সভার বুদ্ধি হৈল নাশ ।  
 সুপাঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ ॥ ২৫০  
 তথাপি দাস্তিক পঢ়ুয়া নম্র নাহি হয় ।  
 যাহাঁ যাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয় ॥ ২৫১  
 সর্বজ্ঞ গোসাঞি জানি তা-সভার দুর্গতি ।  
 ঘরে বসি চিন্তে তা সভার অব্যাহতি—॥ ২৫২

যত অধ্যাপক, আর তাঁর শিষ্যগণ ।  
 ধর্মী কর্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন ॥ ২৫৩  
 এই সব-মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে ।  
 আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥ ২৫৪  
 নিস্তারিতে আইলাঙ্ আমি, হৈল বিপরীত ।  
 এ সব-দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ? ॥ ২৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২৫০-৫১ । প্রভুর নিন্দায়—প্রভুর নিন্দা করার অপরাধে । সভার—সমস্ত পঢ়ুয়ার । সুপাঠিত বিদ্যা—যে বিদ্যা সম্যক্রূপে অধ্যয়ন পূর্বক শিক্ষা করা হইয়াছে । না হয় প্রকাশ—বাহির হয় না ; কার্যকালে মনে থাকে না । নিন্দা হাসি—নিন্দা ও হাসি ঠাট্টা । যাহা তাঁহা—যেখানে সেখানে ।

২৫২ । সর্বজ্ঞ গোসাঞি—সর্বজ্ঞ শ্রীমন্ মহাপ্রভু । চিন্তে ইত্যাদি—নিন্দাজনিত অপরাধ হইতে পঢ়ুয়াগণ ক্রমে নিষ্কৃতি পাইবে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন । অব্যাহতি—নিষ্কৃতি ; পরিত্রাণ । প্রভু যাহা চিন্তা করিলেন, পরবর্তী ২৫৩-২৬০ পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে ।

২৫৩ । প্রভুর নিন্দাকারীদের বিবরণ বলা হইতেছে । অধ্যাপক—টোলের অধ্যাপকগণ । ইহাদের সমব্যবসায়ী ও সমকর্মী—অথচ বয়সে অনেকের অপেক্ষাই ছোট—নিমাই-পণ্ডিতের অসাধারণ প্রতিভা, প্রসার-প্রতিপত্তি এবং সর্বোপরি নূতন ধর্ম-মত-প্রচারের-গৌরবে দীর্ঘায়িত হইয়াই বোধ হয় এই সমস্ত অধ্যাপকগণ প্রভুর নিন্দা করিতেন । আর তাঁহাদের ইঙ্গিতে, অথবা তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া, কিম্বা তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্তই হয় তো তাঁহাদের শিষ্য-পঢ়ুয়াগণও প্রভুর নিন্দা করিতেন । ধর্মী—মঙ্গলচণ্ডী বা বিষহরির পূজা এবং তদুপলক্ষে নৃত্যকীর্তন ও রাত্রি-জাগরণকেই যাহারা হিন্দুর আদর্শ-ধর্ম বলিয়া মনে করিত, তাহারা । অথবা, স্বধর্ম ( বর্ণাশ্রমধর্ম ) আচরণকারী । কর্মী—বর্ণাশ্রম-ধর্মকেই যাহারা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহারা । তপোনিষ্ঠ—কঠোর তপস্বাদিতে যাহারা নিরত ছিলেন, তাহারা । এসমস্ত ধর্মী, কর্মী এবং তপোনিষ্ঠগণ স্ব-স্ব-অনুষ্ঠানাদিকেই একমাত্র ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রভুর প্রবর্তিত নাম-সঙ্কীর্ণনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রভুর নিন্দা করিতেন । নিন্দুক দুর্জ্জন—অধ্যাপক, পঢ়ুয়া, ধর্মী, কর্মী ও তপোনিষ্ঠগণ প্রভুর ও কীর্তনের নিন্দা করিত বলিয়া তাহাদিগকে নিন্দুক দুর্জ্জন বলা হইয়াছে ।

২৫৪ । এই সব—অধ্যাপকাদি । মোর নিন্দা ইত্যাদি—আমার ( প্রভুর ) নিন্দাজনিত অপরাধ বশতঃ । আমি না ইত্যাদি—আমার নিন্দা করায় আমার নিকটে ইহাদের অপরাধ হইয়াছে ; সুতরাং ইহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমি যদি ভক্তি-পথে ইহাদের মতিকে পরিচালিত না করি, তাহা হইলে আপনা হইতে ইহাদের মতি ভক্তির পথে অগ্রসর হইবেনা । কাহারও নিকটে অপরাধ হইলে সেই অপরাধের ক্ষমা না পাওয়া পর্যন্ত ভক্তির রূপা হইতে পারে না—ইহাই সাধারণ নিয়ম ।

২৫৫ । নিস্তারিতে—সমস্ত লোককে উদ্ধার করিতে । হৈল বিপরীত—উল্টা হইল । প্রভুর কথার মর্ম এই যে, তিনি আবিভূত হইয়াছেন বলিয়াই তাহারা তাঁহার নিন্দা করার সুযোগ পাইয়াছে ; সুতরাং নিন্দাজনিত অপরাধে অপরাধী হইয়া—তাঁহার সঙ্কলিত নিস্তার না পাইয়া—অধঃপাতে যাইতেছে—তাঁহার সঙ্কল্পের বিপরীত ফল ফলিতেছে । কৈছে হইবেক হিত—কিসে ইহাদের মঙ্গল হইবে ? কিরূপে ইহারা এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ?

আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয় ।  
 তবে সে ইহা করে ভক্তি লওয়াইলে নয় ॥ ২৫৬  
 মোরে নিন্দা করে—যে না করে নমস্কার ।  
 এ-সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ ২৫৭  
 অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব ।  
 সন্ন্যাসীর বুদ্ধো মোরে প্রণত হইব ॥ ২৫৮  
 প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয় ।  
 নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ২৫৯  
 এ-সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার ।

আর কোন উপায় নাই, এই যুক্তি সার ॥ ২৬০  
 এই দৃঢ়যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে ।  
 কেশব-ভারতী আইলা নদীয়া নগরে ॥ ২৬১  
 প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ ।  
 ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন—২৬২  
 তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ ।  
 কৃপা করি কর মোর সংসারমোচন ॥ ২৬৩  
 ভারতী কহেন—তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী ।  
 যেই করাহ, সেই-করিব, স্বতন্ত্র নহি আমি ॥ ২৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২৫৬ । নিকৃতির উপায় বলিতেছেন । প্রভুকে প্রণাম করিলেই প্রভুর চরণে ইহাদের অপরাধ ক্ষয় হইতে পারে এবং তখনই উপদেশ পাইলে ইহারা ভক্তির পথ গ্রহণ করিতে পারে । ( যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ ভক্তিপথে কেহ টানিয়া নিতে চাহিলেও অপরাধী ব্যক্তি সেই পথে যাইতে পারে না ) । ১৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৫৭ । অন্বয়—যাহারা আমার নিন্দা করে, অথচ আমাকে নমস্কার করে না (নমস্কার না করায় যাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিতেছি না)—সেই সমস্ত জীবকেও অবশ্যই উদ্ধার করিতে হইবে—(নচেৎ, সমস্ত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত আমার যে সঙ্কল্প আছে, তাহা সিদ্ধ হইবে না) ।

২৫৮ । কিরূপে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন ? যাহাতে তাহারা আমাকে (প্রভুকে) প্রণাম করে, সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—প্রণাম করিলেই তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি । কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহারা প্রণাম করিতে পারে ? সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে—তখন সন্ন্যাসি-বুদ্ধিতে আমাকে প্রণাম করিবে । ১৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৬১ । এইরূপে প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন, এমন সময়ে কেশব-ভারতী নবদ্বীপে আসিলেন ।

২৬২ । নমস্করি—নমস্কার করিয়া । ভিক্ষা—আহার ।

২৬৩ । কেশব-ভারতীর প্রতি প্রভুর উক্তি এই পয়ার । ঈশ্বর বট—জীবের সংসার-মোচনের পক্ষে ঈশ্বরের তুল্য শক্তি ধারণ কর । সাক্ষাৎ নারায়ণ—স্বয়ং নারায়ণের ছায় (সংসার-মোচনের) শক্তি ধারণ কর । সংসার মোচন—সংসার-ক্ষয় । ভোগ-বাসনার ক্ষয় । প্রভু ভঙ্গীতে সংসারাত্মম ত্যাগ করাইয়া সন্ন্যাস দানের প্রার্থনা জানাইলেন ।

২৬৪ । ভারতী কহেন—প্রভুর কথা শুনিয়া কেশব-ভারতী বলিলেন ।

অন্বয় :—কেশব-ভারতী বলিলেন—“তুমি ঈশ্বর, তুমি অন্তর্যামী ; তুমি যাহা করাইবে, আমি তাহাই করিব ; তোমার নিকটে আমার স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই ।”

ভারতী-গোস্বামীর নিকটে প্রভু ভঙ্গীতে সন্ন্যাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; ভারতীও ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইয়া গেলেন । প্রভুর কৃপায় ভারতী প্রভুর তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন ; তাই প্রভুকে “ঈশ্বর, অন্তর্যামী” বলিলেন । এত সহজে প্রভুকে সন্ন্যাসদানে ভারতীর সম্মত হওয়ায় হেতু এই যে, ভারতী বুঝিয়াছিলেন—প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আর তিনি স্বরূপতঃ তাঁহার দাস ; প্রভু যদি তাঁহার যোগেই সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিবেদন করিবার তাঁহার আর কি শক্তি আছে ?

এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেল।  
মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা ॥ ২৬৫  
সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।  
মুকুন্দদত্ত—এই তিন কৈল সর্বকার্য্য ॥ ২৬৬  
এই আদিলীলার কৈল সূত্রগণন।

বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ২৬৭  
যশোদানন্দন হৈল শচীর নন্দন।  
চতুর্বিধ ভক্তভাব করে আশ্বাদন ॥ ২৬৮  
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আশ্বাদিতে।  
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬৫। কাটোয়া—বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত একটি নগর। **তাহা যাই**—কাটোয়াতে যাইয়া। **সন্ন্যাস করিলা**—সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, প্রভুর চতুর্কিংশবর্ষের মাঘী সংক্রান্তিতে। ( ভূমিকা দ্রষ্টব্য )।

২৬৬। **সর্বকর্ম্ম**—সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় অবশ্য-কর্তব্য অমুষ্ঠানাদির আয়োজনরূপ কার্য্য। **সঙ্গে** ইত্যাদি—প্রভু গৃহত্যাগ করিয়া কণ্টক-নগরে ( কাটোয়াতে ) উপনীত হইলে, পূর্বে “যারে যারে আজ্ঞা প্রভু করিয়া আছিল। তাঁহারাও অগ্নে অগ্নে আসিয়া মিলিলা ॥ অবধূতচন্দ্র ( নিত্যানন্দ ), গদাধর, শ্রীমুকুন্দ। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর ব্রজানন্দ ॥ আইলেন প্রভু যথা কেশব-ভারতী। মত্তসিংহপ্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি ॥” সন্ন্যাসের আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রভু চন্দ্রশেখর-আচার্য্যকে আদেশ করিলেন—“বিধি যোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি। তোমারেই, প্রতিনিধি করিলাম আমি ॥” তদনুসারে চন্দ্রশেখর “দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মুদগ, তাম্বুল, চন্দন। পুষ্প, যজ্ঞহুত্র, বস্ত্র” ও নানাবিধ ভক্ষ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। অত্যাচ্ছ সকলেই সন্ন্যাসের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের আনুকূল্য করিয়াছিলেন।  
শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ২৬।

২৬৭। **এই**—পূর্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে। **বিস্তারি বর্ণিলা**—শ্রীচৈতন্যভাগবতে।

২৬৮-৬৯। শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও তাঁহার অবতারের প্রয়োজন বলিতেছেন। সাক্ষাৎ যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য—ইহাই তাঁহার তত্ত্ব। **চতুর্বিধ ভক্তভাব**—দাস, সখা, পিতামাতা ও কান্তা—এই চারি প্রকার ভক্তের চারি প্রকার ভাব; এই চারিটি ভাব এই—দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; **স্বমাধুর্য্য**—নিজের ( শ্রীকৃষ্ণের ) মাধুর্য্য। **রাধা-প্রেমরস আশ্বাদিতে**—আশ্রয়ভাবে শ্রীরাধাপ্রেমের মাধুর্য্য আশ্বাদন করিতে। আশ্রয়রূপে শ্রীরাধাপ্রেমরস এবং স্নীয় মাধুর্য্য আশ্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহাই তাঁহার অবতারের মুখ্য প্রয়োজন। আশ্রয়রূপে রাধা-প্রেমরস এবং স্বমাধুর্য্যও তিনি আশ্বাদন করিয়াছেন এবং বিষয়রূপে আবার দাস-সখাদি চতুর্কিংশ ভক্তের দাস্ত-সখ্যাদি চতুর্কিংশ ভাবও আশ্বাদন করিয়াছেন ( তাঁহার পরিকর-স্থানীয় চতুর্কিংশ ভক্ত লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন )।

এই পয়ারদ্বয় হইতে বুঝা যায়—শ্রীচৈতন্যপ্রভু দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই চারিভাবেরই বিষয় এবং রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া মধুর-ভাবের আশ্রয়ও বটেন। অর্থাৎ তিনি দাস্ত, সখ্য ও বাৎসল্যের মুখ্যতঃ বিষয়; আর তিনি মধুর ভাবের বিষয় এবং আশ্রয় দুইই। রাধাভাবের আশ্রয়স্বহেতুই তিনি রাধাভাবদ্যুতিস্ববলিত। যে সমস্ত কান্তাভাবের উপাসক শ্রীচৈতন্যকে রাধাভাবদ্যুতিস্ববলিত বলিয়া চিন্তা করেন, তাঁহাদের উপাসনায় তিনি মুখ্যতঃ শ্রীরাধা—কৃষ্ণকান্তা, কিন্তু কৃষ্ণ নহেন; রাধাভাবের আশ্রয়। তিনি মধুরভাবের বিষয়ও—স্বতরাং কোনও কোনও কান্তাভাবের উপাসক তাঁহাকে কান্ত বা নাগররূপেও চিন্তা করিতে পারেন; শ্রীল নরহরি-সরকার-ঠাকুর-প্রমুখ নাগরীভাবের উপাসকগণের উপাসনা বোধ হয় এই ভাবের অনুকূল; তাঁহাদের উপাসনায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু রাধা-ভাবদ্যুতিস্ববলিত নহেন—তিনি গৌরবর্ণ কৃষ্ণ—রাধাদ্যুতিস্ববলিত কৃষ্ণ—কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধাকর্ত্তক সর্বাস্থে আলিঙ্গিত কৃষ্ণও বরণ হইতে পারেন। আর দাস্ত, সখ্য ও বাৎসল্যভাবের উপাসকগণের উপাসনায়ও তিনি বিষয়-

গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত ।  
 ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে—আপনার কান্ত ॥ ২৭০  
 গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়—  
 ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অগ্নত্র না হয় ॥ ২৭১  
 শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাবিভূষণ ।  
 গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন ॥ ২৭২

ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অগ্ন্যকার ।  
 গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার ॥ ২৭৩  
 তথাহি ললিতনাথবে ( ৬।১৪ )—  
 গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্ত কস্তাংকৃতী-  
 বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুঃক্লেশপদবীক্ষণারিণঃ প্রক্রিয়াম্ ।  
 আদিকুর্কতি বৈষ্ণবীমপি তন্মুং তস্মিন্ভূজৈর্জিষ্ণুভি-  
 র্যাসাংহস্ত চতুর্ভিরদ্ধৃতকচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

গোপীনামিতি । কঃ কৃতী কঃ পশুতো ভক্তো বা গোপীনাং ভাবস্ত তাং প্রসিদ্ধাং প্রক্রিয়াং ভাবমুদ্রাং ব্যাপার-  
 নিতি যাবৎ বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে সমর্থো ভবতি ন কোহপীত্যর্থঃ । কথন্তুতস্ত ভাবস্ত ? পশুপেন্দ্র-নন্দনজুষঃ পশুপেন্দ্রনন্দনং  
 নন্দপুত্রং জুষতে সেবতে তস্ত ; পুনঃ কথন্তুতস্ত ? দুঃক্লেশপদবীক্ষণারিণঃ দুঃক্লেশায়াং অর্ন্তঃ রোচুশশক্যারিণঃ পদব্যাং  
 সঞ্চারিণঃ সঞ্চারিতুং শীলং যস্ত । যতো জিষ্ণুভির্জয়শীলৈঃ চতুর্ভির্ভূজৈরুপলক্ষিতাং অদ্বিতা চমৎকারিণী কচি শোভা যস্তা স্তাং  
 বৈষ্ণবীং তন্মুং পরিহার্যমানাদিকুর্কতি তস্মিন্ কক্ষোংপি হস্ত আশ্চর্য্যে যাসাং গোপীনাং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি সন্দোচায়মানো  
 ভবতীত্যর্থঃ । চক্রবর্তী । ৮

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাত্র—আশ্রয় নহেন । চারিভাবেরই বিষয়রূপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপাসনা হইতে পারিলেও কান্তাভাবের (রাধাপ্রেমের)  
 আশ্রয়রূপে তাঁহার উপাসনাই তাঁহার অবতরণের বৈশিষ্ট্য বা মুখ্য উদ্দেশ্যের অঙ্গকূল ।

২৭০। গোপীভাব—রাধাভাব । কান্ত—পতি । শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য নিজেকে  
 রাধা বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় কান্ত বলিয়া মনে করেন ।

২৭১-৭৩। সুদৃঢ় নিশ্চয়—সুদৃঢ় নিশ্চিত লক্ষণ । অগ্নত্র—দ্বিভূজ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অগ্ন কাহারও  
 প্রতি এই ( কান্ত )-ভাব প্রয়োজিত হয় না । ব্রজবধুদিগের কান্তাভাবের অপূর্ব-বৈশিষ্ট্য এই যে, দ্বিভূজমুরলীধর  
 শিখি-পিচ্ছ-গুঞ্জাবিভূষণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত অগ্ন কোনও স্বরূপের প্রতি তাঁহাদের এই কান্তাভাব প্রয়োজিত হয়  
 না ; অগ্নের কথা তো দূরে, স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনও যদি কৌতুকবশতঃ কখনও অগ্ন রূপ ধারণ করেন, তাহা হইলেও সেই  
 অগ্ন রূপের নিকট ব্রজবধুদের কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায় ; ২৭১-৮১ পয়ারে ব্রজগোপীদিগের ভাবের এই অপূর্ব  
 বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে । বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর কান্তাভাবের সহিত তুলনা করিয়াই বোধ হয় ব্রজগোপীদিগের  
 কান্তাভাবের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে ; লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভের  
 নিমিত্ত তপস্তা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন । “যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরতপো বিহায় কামান স্তুচিরং ধৃতব্রতা ॥ শ্রীভা, ১০।১৬।৩৬ ॥”

শিখিপিচ্ছ—শিখীর ( ময়ূরের ) পিচ্ছ ( পুচ্ছ ) ; ময়ূরের পাখা । গুঞ্জা—কুচ্ ( বা কাইচ্ ) ফল ।  
 গুঞ্জা দুই রকমের—রক্ত ও ধেত । বিভূষণ—সজ্জা । শিখিপিচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ—শিখিপিচ্ছ ( ময়ূর-পাখা )  
 এবং গুঞ্জা ( -মালা ) বিভূষণ যাহার । যিনি চূড়ায় শিখিপাখা এবং বক্ষে গুঞ্জামালা ধারণ করেন । ত্রিভঙ্গিম—  
 গ্রীবা ( ঘাড় ), কটী ও জাহ্ন ( হাঁটু ) এই তিন স্থল বাঁকাইয়া যিনি দাঁড়ান । মুরলী-বদন—যাহার মুখে  
 ( বদনে ) মুরলী থাকে । শ্রীকৃষ্ণের যে রূপে গোপীকাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, ২৭২ পয়ারে তাহারই বর্ণনা দেওয়া  
 হইয়াছে । ইহা ছাড়ি—২৭২ পয়ারোক্ত রূপব্যতীত । অগ্ন্যকার—অগ্নরূপ আকার ; চতুর্ভূজাদিরূপ ।  
 গোপীকার ভাব—গোপীদের কান্তাভাব । না যায় ইত্যাদি—সেই অগ্নরূপের প্রতি তাঁহাদের কান্তাভাব  
 স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় না । ইহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৮। অন্বয় । দুঃক্লেশপদবীক্ষণারিণঃ ( দুঃক্লেশ-পথ-সঞ্চারী ) পশুপেন্দ্র-নন্দজুষঃ ( নন্দ-নন্দননিষ্ঠ )



গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

গোপীনাং ( গোপীদিগের ) ভাবন্ত ( ভাবের ) তাং ( সেই ) প্রক্রিয়াং ( প্রক্রিয়া ) বিজ্ঞাতুং ( জানিতে—বুঝিতে ) কঃ ( কোন্ ) কৃতী ( কৃতী ব্যক্তি ) ক্ষমতে ( সমর্থ ) হয় ? [ যতঃ ] ( যেহেতু ) হস্ত ( আশ্চর্য—আশ্চর্যের—বিষয় এই যে ) জিষ্ণুভিঃ ( জয়শীল ) চতুর্ভিঃভুজৈঃ ( চারিটা হস্তদ্বারা ) অদ্ভুতকৃচিং ( অদ্ভুত-শোভাবিশিষ্ট ) বৈষ্ণবীং তনুং ( শ্রীবিষ্ণুমূর্তি ) আবিস্করতি ( প্রকটনকারী ) তস্মিন্ ( তাঁহাতে—সেই শ্রীকৃষ্ণে ) অপি ( ও ) যাসাং ( যাহাদের—যে গোপীদের ) রাগোদয়ঃ ( অনুরাগোল্লাস ) কুঞ্চতি ( সঙ্কুচিত হয় ) ।

**অনুবাদ ।** গোপিকাদিগের নন্দ-নন্দননিষ্ঠ এবং দুর্লভ-পথ-সঞ্চরণশীল ভাবের প্রক্রিয়া, কোন্ কৃতী ব্যক্তিই না অবগত হইতে সমর্থ ? ( অর্থাৎ কেহই সমর্থ হয় না ) । যেহেতু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ( স্বীয় রূপ গোপন করিবার উদ্দেশ্যে, কৌতুকবশতঃ ) সেই নন্দ-নন্দনই যদি জয়শীল চতুর্ভুজদ্বারা উপলক্ষিত শ্রীবিষ্ণুমূর্তি প্রকটিত করেন, তাহা হইলে তাঁহাতেও ( সেই—শ্রীকৃষ্ণেও ) তাঁহাদের ( গোপীদের ) রাগোল্লাস সঙ্কুচিত হয় । ৮

ললিত-নাথব-গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কোনও এক কল্পে মাথুর-বিরহে অধীর হইয়া শ্রীরাধা যমুনায়া বাঁপ দিয়া-ছিলেন ; তাহা দেখিয়া বিশাখাদি সখীগণও যমুনায়া বাঁপ দিলেন । সূর্য্যকন্ঠা যমুনা তাঁহাদিগকে লইয়া সূর্য্যালোকে গিয়া সূর্য্যদেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিলেন । সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধা অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিলে সূর্য্যপত্নী ছায়া শ্রীরাধার সান্ত্বনার নিমিত্ত এক উপায় স্থির করিলেন । সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া ছায়াদেবী মনে করিলেন, সূর্য্যমণ্ডলস্থিত নারায়ণই শ্রীরাধার বল্লভ ; সুতরাং তাঁহার সহিত মিলিত হইলেই শ্রীরাধা সান্ত্বনা লাভ করিবে । তাই তিনি শ্রীরাধাকে বলিলেন—“রাধে ! তুমি ব্যাকুল হইও না ; তোমার প্রাণবল্লভ এই সূর্য্যমণ্ডলেই অবস্থিত ।” ছায়াদেবীর কথা শুনিয়া বিশাখা তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে ।

**দুর্লভ-পদবী-সঞ্চারিণঃ—**দুর্লভ—অগ্নের আরোহণের অযোগ্য, পদবীতে [ ( পথে ) সঞ্চরণশীল ; যষ্টা বিভক্তি, “ভাবের” বিশেষণ । গোপীদিগের ভাব—কাস্তাভাব—দুর্লভ-পদবী-সঞ্চারী—অপর কেহ যে পথে কখনও আরোহণ করিতে পারে না, সেই পথেই বিচরণ করিয়া থাকে ; সুতরাং ইহা অপরের—গোপীগণ ব্যতীত অণু কাহারও—বোধগম্য নহে ; তাই এস্থলে দুর্লভ-পদবী-সঞ্চারী অর্থ—অগ্নের বুদ্ধির গতির অতীত—অগ্নে যাহা বৃষ্টিতে পারে না । **পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুষঃ—**পশু ( গো- ) দিগকে পালন করে যাহারা, তাহারা পশুপ—গোপ ; তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রতুল্য অর্থাৎ রাজা যিনি, তিনি পশুপেন্দ্র—শ্রীনন্দমহারাজ ; তাঁহার নন্দন—পশুপেন্দ্র-নন্দন—ব্রজেন্দ্র-নন্দন—শ্রীকৃষ্ণ ; তাঁহার সেবা ( জুষ-ধাতুর অর্থ সেবা ) করে যে, তাহা হইল পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুট—ইহার যষ্টা বিভক্তিতে পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুষঃ ; ইহা “ভাবের” বিশেষণ । মর্শ্ব—যাহা একমাত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই নিয়োজিত, সেই ভাবের—ব্রজেন্দ্রনন্দননিষ্ঠ কাস্তাভাবের । দ্বিজ-মুরলীধর ব্রজেন্দ্র-নন্দনই যে গোপীদিগের কাস্তাপ্রেমের একমাত্র বিষয়ালম্বন—তাহাই স্মৃতিত হইল । **গোপীনাং ভাবন্ত—**গোপীদিগের ভাবের—কাস্তাভাবের । এই ভাব কিরূপ ? দুর্লভ-পদবী-সঞ্চারী এবং পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুট । **প্রক্রিয়াং—**পদ্ধতি ; প্রকৃতি ; গোপীদের কাস্তাভাবের প্রকৃতি বা স্বরূপ । **বিজ্ঞাতুং—**বিশেষরূপে জানিতে । **জিষ্ণুভিঃ চতুর্ভিঃ ভুজৈঃ—**জয়শীল চারিটা হস্ত দ্বারা । **জিষ্ণুভিঃ ( জয়শীল )—**শব্দের সার্থকতা এই যে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চারিটা হস্ত দ্বারা শ্রীবিষ্ণু সকলকেই জয় করিতে পারেন । এস্থলে ব্যঞ্জনা এই যে, এই জয়শীল হস্ত-চতুষ্টয়ও কিন্তু গোপীদের ভাবকে জয় করিতে পারে নাই—চতুর্ভুজরূপ দেখিয়া গোপীদের কাস্তাভাব উচ্ছ্বসিত না হইয়া বরং সঙ্কুচিত হইয়াছে । **বৈষ্ণবীং তনুং—**বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বা বিষ্ণুর স্বরূপভূত দেহ ; বিষ্ণুমূর্তি । **রাগোদয়ঃ—**রাগের ( কাস্তাভাবোচিত প্রীতির ) উদয় বা উল্লাস । **কুঞ্চতি—**সঙ্কুচিত হয় ।

২৭৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ।

ব্রজসুন্দরীগণের ভাব শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ; শ্রীকৃষ্ণের ভগবন্তার কথা তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না ; তাঁহারা এই মাত্র

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ-নন্দন এবং তাঁহাদের প্রাণবল্লভ । তাই ছায়াদেবীর কথা শুনিয়া বিশাখা হয়তো প্রথমে বুঝিতেই পাবেন নাই—তিনি কেন স্বর্ধ্যমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণকে শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিতেছিলেন । সম্ভবতঃ তখন তাঁহার মনে পড়িল যে, শ্রীকৃষ্ণের নামকরণের সময়ে গঙ্গাচার্য্য নাকি বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ “নারায়ণসমো গুণৈঃ ।” ইহা মনে করিয়া তিনি মনে করিলেন, এই নারায়ণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গুণসাম্য—অধিকন্তু বর্ণসাম্য—আছে বলিয়াই বোধ হয় ছায়া-দেবী নারায়ণকে শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিয়াছেন । ইহা মনে করিয়াই বিশাখা ছায়া-দেবীকে বলিলেন—

“তুমি মনে করিয়াছ, বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করিলেই শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহ-ব্যথা প্রশমিত হইবে ; কিন্তু ইহা তোমার ভ্রান্ত ধারণা । ঐশ্বর্য্যময়-বিষ্ণুমূর্তির কথা তো দূরে, স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন যদি কোতুকবশতঃ তাঁহার ব্রজের সমস্ত মাধুর্য্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চতুর্ভূজরূপ ধারণ করেন, তাহা হইলে সেই পূর্ণ-মাধুর্য্যময় চতুর্ভূজরূপ দেখিয়াও শ্রীরাধার কাস্তাভাব সঙ্কুচিত হইবে । শ্রীরাধার কথাই বা বলি কেন ? শ্রীরাধার কথা উঠিতেই পারে না—কারণ, তাঁহার সখীস্থানীয়া গোপবধূদের কাস্তাভাবও সেই চতুর্ভূজরূপ দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া যায় । বস্তুতঃ, গোপবেশ-বেণুকর, নবকিশোর-নটবর, দ্বিভূজ-শ্যামসুন্দররূপ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণেরই অণু বেশে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয় না—বিষ্ণুমূর্তির কথা আর কি বলিব ? নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই বিশাখা এই কথা বলিলেন ; যে লীলায় তাঁহার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত মাত্র উক্ত-শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে । পরবর্তী ২৭৪-৮০ পয়ায়ে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী এই লীলাটি বর্ণন করিয়াছেন ।

লীলাটি এই । এক সময়ে বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রজবধূদের সঙ্গে গোবর্দ্ধনে রাসলীলা করিতেছিলেন । একাকিনী শ্রীরাধাকে লইয়া নিভৃত-নিকুঞ্জে বিহার করার নিমিত্ত হঠাৎ তাঁহার ইচ্ছা হইল ; ইঙ্গিতে শ্রীরাধাকে তাঁহার উদ্দেশ্য জানাইয়া তিনি রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং শ্রীরাধার অপেক্ষায় নিভৃত-নিকুঞ্জে যাইয়া বসিয়া রহিলেন । এদিকে, রাসস্থলীতে কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া গোপবধূগণ রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; অন্বেষণ করিতে করিতে দূর হইতে তাঁহারা দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ এক কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া আছেন । কৃষ্ণও দূর হইতে গোপীগণকে দেখিলেন, দেখিয়া একটু সন্নতও বোধ হয় হইলেন—সকলকে ত্যাগ করিয়া রাসস্থলী হইতে পলাইয়া আসিয়া একাকী নিভৃত-নিকুঞ্জে বসিয়া থাকার কি সম্ভাবজনক উত্তর তিনি তাঁহাদিগকে দিবেন ? কুঞ্জ ছাড়িয়া অগত্যা গিয়া যে আত্মগোপন করিবেন, সেই সুর্যোগও আর ছিল না ; কারণ, গোপীগণ আসিয়া পড়িয়াছেন, পলাইতে গেলেই ধরা পড়িবেন—তখন আরও অধিকতররূপে বিব্রত হইতে হইবে । অণু কোনও উপায় না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন—“হায়, হায় ! কি করি ? যদি এসময় আমার আরও দুইটি হাত বাহির হইত, যদি চতুর্ভূজ হইতে পারিতাম, তাহা হইলে সম্ভবতঃ গোপীদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম—দূর হইতে আমার বর্ণ দেখিয়াই তাঁহারা ‘কৃষ্ণ’ মনে করিয়া এদিকে আসিতেছেন ; কিন্তু কুঞ্জের ভিতরে আসিয়া যখন চারিটি হাত দেখিবেন, তখনই তাঁহারা নিজেদিগকে ভ্রান্ত মনে করিয়া অগত্যা চলিয়া যাইবেন । কিন্তু আর দুইটি হাতই বা কোথায় পাইব ?” ব্রজে মাধুর্য্যের পূর্ণতম অধিকার হইলেও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তিও সেখানে আছে—তবে বিশেষত্ব এই যে, ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন—কারণ, ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্রজে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে ঐশ্বর্য্যকে অঙ্গীকার করেন না ; কিন্তু, পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা পতিগতপ্রাণা পত্নীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি সুর্যোগ পাইলেই অলক্ষিতভাবে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন । তাই, চতুর্ভূজ হওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের যে ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণকে তৎক্ষণাতঃ চতুর্ভূজ করিয়া দিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চারিটি বাহু দেখিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন । ইত্যবসরে গোপীগণ আশাব্যিত হইয়া কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়াই কুঞ্জমধ্যস্থিত শ্যামসুন্দর-মূর্তির দিকে চাহিয়া হতাশ হইলেন ! ইনি তো তাঁদের প্রাণবধূয়া শ্রীকৃষ্ণ নহেন ? ইনি তো দেখা যাইতেছে চতুর্ভূজ নারায়ণ ! তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত কাস্তাভাব সঙ্কুচিত হইয়া গেল । তাঁহারা করজোড়ে শ্রীনারায়ণকে স্তুতি-নতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রার্থনা নিবেদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অগত্যা চলিয়া গেলেন । ( স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি কোতুক-

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে ।  
 অনুর্কান কৈল সঙ্কেত করি রাধা মনে ॥ ২৭৪  
 নিভৃত-নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট ।  
 অশ্বেষিতে আইলা তাহাঁ গোপিকার ঠাট ॥ ২৭৫  
 দূরে হৈতে কৃষ্ণ দেখি কহে গোপীগণ—।

এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৭৬  
 গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধবস ।  
 লুকাইতে নারিল ভয়ে হইলা বিবশ ॥ ২৭৭  
 চতুর্ভুজ মূর্তি ধরি আছেন বসিয়া ।  
 কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া ॥ ২৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বশতঃ অগুরুপ ধারণ করেন, তাহা হইলে শ্রীরাধার সহচরীগণের ভাবও যে সঙ্কচিত হইয়া যায়, এ পর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল ) । গোপীগণ চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির পথবর্ত্তিনী হইলেন । নিরুপদ্রবে শ্রীরাধাকে একাকিনী পাইবেন—এই ভরসায় শ্রীকৃষ্ণ উৎফুল্ল হইলেন ; ঐ চারিটা হাতের দ্বারা শ্রীরাধাকে চমৎকৃত করিতে পারিবেন ভাবিয়াও তিনি অধিকতর আনন্দ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐ চারিটা হাত রক্ষা করা যেন তাঁহার পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিল—শ্রীরাধা যতই নিকটবর্ত্তিনী হইতেছেন, অতিরিক্ত হাত ছুঁথানা ততই যেন শীঘ্র শীঘ্র অন্তর্হিত হওয়ার চেষ্টা করিতেছে । সে ছুঁথানাকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস নিফল হইল—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার স্পষ্ট-দৃষ্টির মধ্যে আসিবার পূর্বেই অতিরিক্ত হাত-ছুঁথানা সম্যক্রূপে অন্তর্হিত হইল—শ্রীকৃষ্ণ কেবল দ্বিভুজরূপে বসিয়া রহিলেন । ইহা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার মাধুর্য্যময় বিস্ময়ভাবের এক অদ্ভুত প্রভাব—যাহার সাফাতে ঐশ্বর্য্যশক্তি কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না । অতঃ গোপীদের ভাবও শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়—তথাপি কিন্তু তাহাদের সাফাতে ঐশ্বর্য্যশক্তি কিয়ৎ-পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে তাঁহাকে চতুর্ভুজরূপ দিতে পারিয়াছিল । কিন্তু শ্রীরাধার ভাব সর্বাতিশাযী ; তাহার প্রভাব এতই বেশী যে, শ্রীকৃষ্ণের বলবতী ইচ্ছা এবং প্রবল প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্যশক্তি অতিরিক্ত দুইটা হাত অন্তর্হিত করিতে—কোটস্থির বিকাশে সামান্য থাটোতকের ত্রায়—সম্যক্রূপে আত্মগোপন করিতে—বাধ্য হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা এবং প্রয়াস অপেক্ষাও শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাব অমেক বেশী শক্তিশালী ( পরবর্ত্তী ৯ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ) ।

২৭৪-৭৫ । গোবর্দ্ধনে—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকট রাসোলি-নামক স্থানে । সঙ্কেত করি ইত্যাদি—নিভৃত বিহারের নিমিত্ত শ্রীরাধাও যেন রাসস্থলী ছাড়িয়া নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন, এই উদ্দেশ্যে শ্রীরাধাকে ইঙ্গিত করিয়া । নিভৃত—নির্জন । রাধার বাট—শ্রীরাধার পথ ( বাট অর্থ রাস্তা ) । শ্রীরাধা আসিতেছেন কিনা, তাহা দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া আছেন—শ্রীকৃষ্ণ । অশ্বেষিতে—শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিতে । তাহা—সেই স্থানে ; নিভৃত নিকুঞ্জের নিকটে । গোপিকার ঠাট—গোপীসকল ।

২৭৭-৭৮ । সাধবস—দ্রাস, ভয় । গোপনে রাসস্থলী ছাড়িয়া আসিয়া একাকী নিভৃত-নিকুঞ্জে বসিয়া থাকার কি সন্তোষজনক উত্তর দিবেন, তাহা ভাবিয়া কৃষ্ণের ভয় হইল । কারণ, তিনি যে একাকিনী শ্রীরাধার সহিত নিভৃতে ক্রীড়া করার উদ্দেশ্যেই পলাইয়া আসিয়াছেন, একথা গোপীদের নিকটে প্রকাশ করিতে পারিবেন না, করিলে তাঁহারা মানিনী হইবেন বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন । লুকাইতে ইত্যাদি—কুঞ্জ ছাড়িয়া অগ্নত্র আত্মগোপন করিতেও পারিলেন না ; তখন আর পলাইবার সময় ছিল না । গোপীগণ নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন, পলাইতে গেলেই ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ হইতে হইবে ; তাই কুঞ্জে বসিয়াই ভয়েতে প্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন । চতুর্ভুজ মূর্তি ইত্যাদি—তাঁহার এই ভয় দেখিয়া এবং আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে চতুর্ভুজ হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি, তাঁহাকে চতুর্ভুজরূপ দিয়া দিলেন ( পূর্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য ) এবং সেই চতুর্ভুজরূপেই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া রহিলেন । কৃষ্ণ দেখি—যাহাকে একটু আগে দূর হইতে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া ।

ইহৌ কৃষ্ণ নহে, ইহৌ নারায়ণমূর্তি ।  
 এত বলি তাঁরে সভে করে নতি-স্তুতি ॥ ২৭৯  
 নমো নারায়ণ দেব ! করহ প্রসাদ ।  
 কৃষ্ণসঙ্গ দেহ, মোর খণ্ডাহ (ঘুচাহ) বিষাদ ॥ ২৮০  
 এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ ।  
 হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন ॥ ২৮১  
 রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে হাশ্র করিতে ।  
 সেই চতুর্ভূজ মূর্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৮২  
 লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে ।

বহুযত্ন কৈল কৃষ্ণ—নারিল রাখিতে ॥ ২৮৩  
 রাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য প্রভাব ।  
 যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজস্বভাব ॥ ২৮৪  
 উজ্জলনীলমণৌ নাথিকা-ভেদপ্রকরণে ( ৬ )—  
 রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-  
 দৃষ্টং গোপয়িতুং স্মদ্রবধিয়া যা স্তৃষ্ট সন্দর্শিতা ।  
 রাধায়াঃ প্রণয়স্ত হস্ত মহিমা যস্ত শ্রিয়া রক্ষিতুং  
 সা শক্যা প্রভবিষুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ভূজতা ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

রাসারম্ভেতি । তত্রচৈতন্যপ্রমাণমাহ রাসেতি । যা চতুর্ভূজতা । শ্রীজীব । ৯।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২৭৯-৮০ । ইহৌ কৃষ্ণ ইত্যাদি—ইনি তো দেখিতেছি নারায়ণ ; আমরা দূর হইতে চারি হাত দেখিতে না পাইয়া ভুল করিয়াছিলাম । নতি স্তুতি—নমস্কার ও স্তব । নমোনারায়ণ ইত্যাদি—নতিস্তুতি করিয়া গোপীগণ বলিলেন—“হে নারায়ণ ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও ; আমাদের প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে মিলাইয়া দাও—আমাদের দুঃখ দূর কর ।” বিষাদ—দুঃখ । খণ্ডাহ—খণ্ডন কর ; দূর কর ।

২৮১-৮৩ । হেনকালে—গোপীগণ চলিয়া যাওয়া মাত্রই । রাধা আসি ইত্যাদি—শ্রীরাধা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলেন ; শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, দূরে শ্রীরাধা আসিতেছেন । তাঁরে হাশ্র করিতে—শ্রীরাধাকে হাশ্র করিতে ; শ্রীরাধার সহিত কোতুক-রঙ্গ করিতে । লুকাইল—অস্তহিত হইল । দুই ভুজ—দুই বাহু ; অতিরিক্ত যে দুই বাহু প্রকটিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভূজ হইয়াছিলেন, সেই দুই বাহু । রাধার অগ্রেতে—শ্রীরাধার সন্মুখে ; শ্রীরাধার উপস্থিতিমাত্র । বহুযত্ন ইত্যাদি—সেই দুই বাহু রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু রাখিতে পারিলেন না ; কারণ, শুদ্ধ-মাদুর্য্যের প্রতিমূর্তি শ্রীরাধার সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্য কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না—শ্রীকৃষ্ণের বলবতী ইচ্ছাসম্বন্ধেও না ( পূর্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য ) ।

২৮৪ । বিশুদ্ধ ভাবের—ঐশ্বর্য্য-গন্ধলেশশূন্য শুদ্ধ-মাদুর্য্যময় ভাবের । যে—যে বিশুদ্ধভাব । করাইল ইত্যাদি—চতুর্ভূজস্থ ঘুচাইয়া কৃষ্ণের স্বরূপাত্মবন্ধী দ্বিভুজরূপ দিলেন—একমাত্র যে দ্বিভুজরূপ গোপসুন্দরীদের রতির বিষয়ালম্বন । দ্বিভুজ-স্বভাব—স্বরূপসিদ্ধ দ্বিভুজরূপ । “কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ । ২।২।৮৩” পূর্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য ।

২৭৪-৮৪ পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিয়ে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো । ৯ । অম্বয় । রাসারম্ভবিধৌ ( রাসারম্ভ-সময়ে ) কুঞ্জে ( কুঞ্জমধ্যে ) নিলীয় ( লীন হইয়া—লুকাইয়া ) বসতা ( অবস্থানকারী ) হরিণা ( শ্রীহরিকর্তৃক )—মৃগাক্ষীগণৈঃ ( মৃগ-নয়না-গোপীগণকর্তৃক ) দৃষ্টং ( দৃষ্ট ) স্বং ( নিজেকে ) গোপয়িতুং ( গোপন করিতে—লুকাইতে ) উদ্ধবধিয়া ( উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা ) যা ( যাহা—যে চতুর্ভূজতা ) স্তৃষ্ট ( সূন্দররূপে ) সন্দর্শিতা ( প্রদর্শিত হইয়াছে )—হস্ত ( অহো ), রাধায়াঃ ( শ্রীরাধার ) প্রণয়স্ত ( প্রেমের ) মহিমা ( মাহাত্ম্য ) [ এবম্ব্যুতঃ ] ( ঈদৃশ ), যস্ত ( যাহার—যে রাধাপ্রেমের ) শ্রিয়া ( প্রভাবদ্বারা ) প্রভবিষুনা অপি ( প্রভাবশালী—সর্বসমর্থ—হইয়াও ) হরিণা ( শ্রীহরিকর্তৃক ) সা ( সেই ) চতুর্ভূজতা ( চতুর্ভূজত্ব ) রক্ষিতুং ( রক্ষিত হইতে ) শক্যা ( সমর্থ ) ন আসীৎ ( হইয়াছিল না ) ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টাকা ।

**অনুবাদ ।** রাসারম্ভে ( রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া ) শ্রীকৃষ্ণ কোনও কুঞ্জমধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে যুগনয়না-গোপিকাগণ সেই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলে, তিনি স্বীয় উত্তমবুদ্ধির প্রভাবে নিজেকে (গোপিকাদিগের নিকট হইতে) লুকাইবার উদ্দেশ্যে স্তম্ভরূপে যে চতুর্ভুজরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; অহো ! শ্রীরাধার এখনই প্রেম-মহিমা, যে প্রেম-মহিমার প্রভাবে—সেই চতুর্ভুজরূপ—শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিশালী হইয়াও—রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়েন নাই । ৯

গোবর্দ্ধন-গিরির উপত্যকায় রাসোলী-নামক স্থানের বসন্তরাস-সদৃশে বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ কোতুকবশতঃ প্রকটিত চতুর্ভুজরূপ, গোপিকাগণের সন্মুখে রক্ষা করিতে পারিলেও—শ্রীরাধার প্রেমের অদ্ভুত প্রভাববশতঃ শ্রীরাধার সন্মুখে যে তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহাই এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে । শ্রীরাধার সাক্ষাতে তিনি চতুর্ভুজরূপ রক্ষা করিতে পারিলেন না কেন ? উত্তর বোধ হয় এইরূপ :—শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্ ; তিনি পরম-স্বতন্ত্র—তাঁহার ঐশ্বর্যের পরম-বিকাশই তাঁহার পরম-স্বাতন্ত্র্যের হেতু ; কিন্তু তিনি পরম স্বতন্ত্র হইলেও প্রেমের অধীন—যে প্রেম তাঁহার ঐশ্বর্য-জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত, সেই প্রেমের অধীন নহেন ; কারণ, সেই প্রেমে তিনি প্রীতলাভ করিতে পারেন না ; তিনি নিজেই বলিয়াছেন “ঐশ্বর্য-শিখিল প্রেমে নহে মোর প্রীতি । ১।৩।১৪॥”—পরন্তু, যে প্রেমে ঐশ্বর্য-জ্ঞানের গন্ধলেশও নাই, যে প্রেম শুদ্ধ-মাধুর্য-ভাবময়, শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমেরই বশীভূত, সেই প্রেমের বশীভূত হইয়া তিনি নন্দ-বশোদার তাড়ন-ভংগন লাভ করিয়া, স্রবলাদিকে স্কন্ধে বহন করিয়া এবং ‘দেছি পদপল্লবমুদারং’ বলিয়া শ্রীরাধার পাদমূলে পতিত হইয়াও অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ শুদ্ধ-মাধুর্য-ভাবময় প্রেমের অধীন বলিয়া তাঁহার ঐশ্বর্যও এই প্রেমের অন্তর্গত—শুদ্ধ-মাধুর্যের অন্তর্গত । যে স্থলে শুদ্ধ-মাধুর্যের বিকাশ, সে স্থলেও—লীলারস-পুষ্টির বা লীলার সহায়তার নিমিত্ত লীলাকারীদের ইচ্ছাশক্তির ইচ্ছিতে, সাধারণতঃ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই—ঐশ্বর্য আত্মপ্রকাশ করিয়া মাধুর্যের সেবা করিয়া যায় ; কিন্তু স্বরূপতঃ শুদ্ধ-মাধুর্যের অন্তর্গত বলিয়া সে স্থলে ঐশ্বর্য কখনও শুদ্ধ-মাধুর্যের বা মাধুর্যাত্মক প্রেমের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে না—শুদ্ধ-মাধুর্য-ভাবাত্মক ভক্তকে তাঁহার ইচ্ছিত ব্যতীত অভিভূত, অপ্রতিভ বা চমৎকৃত করিতে পারে না এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকে কোনও সময়েই শিখিল করিতে পারে না । তাই পুতনা-ভৃগাবর্তবধাদিতে, কি কালীয়-দমনাদিতে, কি গোবর্দ্ধন-ধারণাদিতে, কি গোবর্দ্ধন-গুহায় শ্রীরাধার গৌরীপূজাদিতে, এমন কি রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বহু-প্রকাশমূর্তি-প্রকটনে—অশেষ ঐশ্বর্যের বিকাশ থাকা সত্ত্বেও ব্রজ-পরিকরদের ব্রজেন্দ্র-নন্দন-নিষ্ঠ ভাব সঙ্কুচিত হয় নাই ; কারণ, যে যে স্থলে পরিকরগণ ঐশ্বর্য অনুভবও করিয়াছেন, সে সে স্থলেও শুদ্ধমাধুর্য-বশতঃ তাঁহারা সেই ঐশ্বর্যকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলিয়াই মনে করিতেন না । নিভৃত-নিকুঞ্জে গোপীগণ যে চতুর্ভুজরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণেরই চতুর্ভুজ-প্রাপ্তি মনে করেন নাই—চতুর্ভুজরূপকে নারায়ণ বলিয়াই মনে করিয়াছেন ; তাই, প্রথমে কুঞ্জমধ্যস্থ মূর্তিকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া তাঁহাদের যে প্রেম উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাকে নারায়ণ ভাবিয়া তাহা সঙ্কুচিত হইয়া গেল—শ্রীকৃষ্ণেরই চতুর্ভুজ ভাবিয়া সঙ্কুচিত হয় নাই । যাহা হউক, যে স্থলে শুদ্ধ-মাধুর্যাত্মক প্রেমের বিকাশ যত বেশী, সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধীনত্বও তত বেশী এবং তাঁহার ঐশ্বর্যের বিকাশ—মাধুর্যের অন্তর্গত ভাবে বিকাশও—তত কম । শ্রীরাধাতে প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ ; সুতরাং তাঁহার কোনওরূপ ইচ্ছিত ব্যতীত, তাঁহাকে চমৎকৃত বা অপ্রতিভ করার জন্ত ঐশ্বর্যের বিকাশ একেবারেই সম্ভব নয় । তাই তাঁহার সাক্ষাতে ঐশ্বর্যজনিত চতুর্ভুজ স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই । অতঃ গোপীদের প্রেমও শুদ্ধ-মাধুর্যময় হইলেও শ্রীরাধা অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের বিকাশ কিছু কম ; তাই লীলারস-পুষ্টির উদ্দেশ্যে—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এতদুভয়েরই অতীষ্ট নিভৃত-নিকুঞ্জ-বিহারের আনুকূল্য-সাধনের উদ্দেশ্যে—তাঁহাদের সাক্ষাতে চতুর্ভুজ প্রকটিত করিয়া ঐশ্বর্যশক্তি তাঁহাদিগকে অতঃ পাঠাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে ; এই সামর্থ্যের দুইটা হেতু :—(১) শ্রীরাধা



সেই ব্রজেশ্বর ইহাঁ—জগন্নাথ পিতা ।

সেই ব্রজেশ্বরী ইহাঁ—শচীদেবী মাতা ॥ ২৮৫

সেই নন্দসুত ইহাঁ—চৈতন্যগোসাঞি ।

সেই বলদেব ইহাঁ—নিত্যানন্দ ভাই ॥ ২৮৬

বাৎসল্য দাস্ত সখ্য—তিন ভাবময় ।

সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায় ॥ ২৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

অপেক্ষা অগ্ৰ গোপীদের মধ্যে প্রেম-বিকাশের নূনতা এবং (২) অগ্ৰ গোপীদের অনুপস্থিতিতে নিভৃত-নিকুঞ্জ-বিলাসের নিমিত্ত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—বিশেষতঃ শ্রীরাধার—ইচ্ছা ( ইহাতে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশে মাধুর্য্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ) ।

অথবা, শ্রীকৃষ্ণ তো এত্রে ঐশ্বর্য্যকে অঙ্গীকারই করেন না, তথাপি ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিয়া থাকিতে পারেনা ; যেহেতু, ঐশ্বর্য্য তাঁহারই শক্তি । তবে ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন—শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতমারে, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে । এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য ইচ্ছা ছিল—নিভৃত নিকুঞ্জে একাকিনী শ্রীরাধার সহিত মিলন । সুতরাং এই মিলনের সুযোগ করিয়া দেওয়াই হইবে ঐশ্বর্য্যশক্তির মুখ্য সেবা । এই সুযোগের জগ্ৰ অগ্ৰ গোপীরা যাহাতে কুঞ্জে না আসেন, তাহা করা দরকার । ঐশ্বর্য্যশক্তি তাহা করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতেই তাঁহার চারিটা হাত প্রকটিত করিয়া । চারিটা হাত দেখিয়াই গোপীগণ মনে করিলেন,—কুঞ্জে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি তাঁদের প্রাণবল্লভ নহেন ; তাই তাঁহারা কুঞ্জ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন । গোপীদের সহিত মিলিত হওয়াই যদি শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের সাক্ষাতেও, কৌতুকবশতঃ চারিটা হাত রক্ষা করার ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের মনে উদ্ভিত হইলেও, ঐশ্বর্য্যশক্তি তাহা রাখিতে পারিতেন না, বা রাখিতেন না ; যেহেতু, তাহাতে গোপীদের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনুকূল্য বিধানরূপ সেবা ঐশ্বর্য্যশক্তির হইত না । যাহাহউক, গোপীগণ চলিয়া গেলেন । চতুর্ভূজরূপও তখনও রহিয়া গেল । শ্রীরাধা আসিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে চতুর্ভূজরূপ রাখার জগ্ৰ কৃষ্ণের ইচ্ছা জন্মিলেও ঐশ্বর্য্যশক্তি তাহা রাখিতে পারিলেন না, বা রাখিলেন না ; যেহেতু, তাহাতে নিভৃত নিকুঞ্জে একাকিনী শ্রীরাধার সহিত মিলনের আনুকূল্য বিধানরূপ সেবা ঐশ্বর্য্যশক্তির সম্ভব হইত না । ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত ; তাই মাধুর্য্যাত্মিকা লীলার প্রতিকূল কোনও কার্য্যই ঐশ্বর্য্যশক্তি সেখানে করিতে পারেন না, লীলার পুষ্ট-সাধনের আনুকূল্যই যথাসম্ভবভাবে করিতে পারেন ।

রাসারম্ভবিধো—রাসের আরম্ভ বিহিত হইলে ; রাসলীলা আরম্ভ হওয়ার পরে । কুঞ্জে নিলিয় বসতা হরিণী—যিনি রাসস্থলী হইতে পলাইয়া গিয়া নিভৃত-নিকুঞ্জে লুকাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই শ্রীহরি কর্তৃক ( পরবর্তী সন্দর্শিতা-ক্রিয়ার কর্তা হইল 'হরিণী'—কর্ম্মবাচ্যে ) । যুগাক্ষীগণৈঃ—যুগের ( হরিণের ) গায় অক্ষি ( চক্ষু ) যাহাদের, সেই গোপীগণ কর্তৃক । হরিণ-নয়না গোপীগণ কর্তৃক ( দৃষ্টঃ ক্রিয়ার কর্তা—কর্ম্মবাচ্যে ) । উদ্ধরমিয়া—প্রতিভারূঢ়া বুদ্ধিদ্বারা ( করণ ) ; প্রতিভা-সম্পন্ন বুদ্ধিদ্বারা । শ্রিয়া—সম্পত্তি দ্বারা ; প্রেমের সম্পত্তি অর্থ প্রেমের প্রভাব । প্রভাবিসুণা—প্রভাবশালী বা সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন ( শ্রীহরি )-কর্তৃক । এই শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইলেও শ্রীরাধার সাক্ষাতে স্বীয় চতুর্ভূজ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না ।

২৮৫-৮৭ । ২৬৮ পয়ারের সঙ্গে এই কয় পয়ারের অঘর । ২৬৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, রাধাভাবে স্বীয় মাধুর্য্যাদির আশ্বাদন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের মুখ্য কারণ হইলেও, বিষয়রূপে তিনি চতুর্বিধ-ভক্তের চতুর্বিধ ভাবও আশ্বাদন করিয়াছেন ; এই চতুর্বিধ ভক্ত লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ; ইহাদের মধ্যে কে কোন্ ভাবের ভক্ত, কাহার কোন্ ভাব প্রভু আশ্বাদন করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে ।

সেই ব্রজেশ্বর ইত্যাদি—দ্বাপরে যিনি ব্রজরাজ নন্দ ছিলেন, তিনিই এই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র । সেই ব্রজেশ্বরী ইত্যাদি—দ্বাপরে যিনি ব্রজরাজপত্নী যশোদা ছিলেন, তিনিই এই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মাতা শচীদেবী । শচীমাতা ও জগন্নাথমিশ্র প্রভুর মাতা-পিতা বলিয়া তাঁহাদের বাৎসল্যভাব ; প্রভুও

প্রেমভক্তি দিয়া তিঁহো ভাসাইল জগতে ।  
তঁাহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে ২৮৮  
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি ভক্ত অবতার ।  
কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার ॥ ২৮৯  
'সখ্য দাস্ত' দুই ভাব—সহজ তাঁহার ।  
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার ॥ ২৯০  
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ ।

নিজনিজভাবে করেন চৈতন্যসেবন ॥ ২৯১  
পণ্ডিতগোসাঞি-আদি ষাঁর যেই রস ।  
সেই-সেই রসে প্রভু হন তার বশ ॥ ২৯২  
তঁহো শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসী ।  
ইহৌ গৌর—কভু দ্বিজ—কভুত সন্ন্যাসী ॥ ২৯৩  
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি ।  
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে—‘প্রাণনাথ’ করি ॥ ২৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

বিষয়রূপে তাঁহাদেরই বাৎসল্যরস আশ্বাদন করিয়াছেন । সেই নন্দমুখ ইত্যাদি—যিনি দ্বাপরে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তিনিই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যপ্রভু । সেই বলদেব ইত্যাদি—যিনি দ্বাপরে শ্রীবলদেব ছিলেন, তিনিই নবদ্বীপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতার গায় । বাৎসল্য দাস্ত ইত্যাদি—শ্রীমন্নিত্যানন্দের ভাব—দাস্ত, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিনভাবের মিশ্রিত ভাব—দাস্ত-সখ্যমিশ্রিত বাৎসল্য ভাব । ( বড়ভাই বলিয়া ছোটভাইয়ের প্রতি বাৎসল্য ) । প্রভুও তাঁহার এই ভাবের আশ্বাদন করেন । কৃষ্ণচৈতন্য-সহায়—পার্বদ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা-সহচর ; নাম-প্রেম-বিতরণ-কার্য্যেও প্রভুর মূল সহায় ।

২৮৮ । কিরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহায়তা করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন । জগতে প্রেমভক্তি-বিতরণই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর একটা উদ্দেশ্য—জীবের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য । শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু অকাতরে এবং নির্বিচারে যাহাকে তাহাকে প্রেমভক্তি দান করিয়া প্রভুর এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্য করিয়াছেন । তাঁহার চরিত্র ইত্যাদি—শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরিত্র সাধারণ লোকের বুদ্ধির অতীত—দুর্বিজ্ঞেয় ।

২৮৯-৯০ । ভক্ত-অবতার—১।৩৭২ এবং ১।৬৯৮ পয়ার দ্রষ্টব্য । কৃষ্ণ অবতারি—স্বীয় আরাধনার প্রভাবে শ্রীগৌরান্বকরূপে কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া । ১।৩৭৬-৮৯ পয়ার দ্রষ্টব্য । সখ্য দাস্ত ইত্যাদি—সখ্য ও দাস্ত এই দুই ভাবই শ্রীঅদ্বৈতের স্বাভাবিক ভাব ; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু কখনও কখনও শ্রীঅদ্বৈতকে গুরুর গায় সম্মান করিতেন ( শ্রীঅদ্বৈত শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর গুরুভাই ছিলেন বলিয়া ) ।

২৯১ । শ্রীবাসাদি ভক্তগণের শ্রীচৈতন্যের প্রতি দাস্তাদিময় ভাব ।

২৯২ । শ্রীলগদধরপণ্ডিত-গোস্বামীর ভাব ছিল মধুর-ভাব । যিনি যেই ভাবের ভক্ত, শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার সেই ভাব আশ্বাদন করিয়া তাঁহার সেই ভাবোচিত সেবায় তাঁহার বশীভূত হইলেন ।

কোনও কোনও গ্রন্থে “সেই সেই রসে প্রভু” স্থলে “সেই সেই রসে কৃষ্ণ”—এইরূপ পাঠান্তর আছে । এস্থলে “কৃষ্ণ”-শব্দে “শ্রীচৈতন্যরূপী কৃষ্ণ” বুঝায় ।

২৯৩-৯৪ । ২৮৬ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন । ইহাতে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? কৃষ্ণ হইলেন শ্যামবর্ণ, আর শ্রীচৈতন্য হইলেন গৌরবর্ণ ; আবার কৃষ্ণ হইলেন গোয়ালী, আর শ্রীচৈতন্য হইলেন ব্রাহ্মণ—পরে সন্ন্যাসী ; শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেন—শ্রীচৈতন্যের বাঁশী নাই ; এরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য কিরূপে এক হইতে পারেন ? ২৯৩ পয়ারে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইয়াছে । ইহার উত্তর দিয়াছেন ২৯৪ পয়ারের প্রথম-পয়ারাঙ্কে—“গোপীভাব ধরি”-বাক্যে । এস্থলে গোপীভাব অর্থ—রাধাভাব ; এবং ভাবের উপলক্ষণে ভাব ও কান্তি উভয়ই লক্ষিত হইতেছে । গোপীভাব বা শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়াছেন—শ্রীরাধার গৌরকান্তির অন্তরালে স্বীয় শ্যামকান্তিকে লুকাইয়া গৌর হইয়াছেন । গোপবিলাসী—গোপ ( বা গোয়ালী )-রূপে বিলাস ( বা লীলা ) করিয়াছেন যিনি ; গোয়ালী বা গোপবেশ ।

সেই কৃষ্ণ সেই গোপী—পরম বিরোধ ।

অচিন্ত্যচরিত্র প্রভুর—অতি স্নদুর্বেদ ॥ ২৯৫

গৌর-রূপা-ভরঙ্গিণী টীকা ।

অঙ্গের বর্ণ এবং মুখের গঠনই কাহাকেও চিনিবার পক্ষে প্রধান সহায় । এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীচৈতন্যের মুখগঠন সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, হয়তো উভয়ের মুখগঠন একরূপই ছিল ( তদ্রূপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ; কারণ, কৃষ্ণের দেহে রাধার বর্ণ সম্যকরূপে মাথিয়া দিয়াই গৌররূপ হইয়াছেন ) ; অথবা, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যকে দেখে নাই, স্মরণে তাঁহাদের মুখগঠন কিরূপ তাহা জানে না—এমন সাধারণ লোক একরূপ প্রশ্ন করিতে পারে আশঙ্কা করিয়াই মুখগঠন সম্বন্ধে কোনও কথা বলা হয় নাই ; তাহাদের মনে কেবল বর্ণসম্বন্ধেই প্রথম এবং প্রধান সন্দেহ উঠিতে পারে ; তাই কেবল বর্ণের সম্বন্ধেই উত্তর দেওয়া হইয়াছে । একই ব্যক্তি—কখনও গোয়ালার বেশ কখনও বা ব্রাহ্মণের বেশ, কখনও বা সন্ন্যাসী বর্ণেও ধারণ করিতে পারে ; আবার কখনও বাঁশী বাজাইতে পারে, কখনও বা বাঁশী ফেলিয়াও দিতে পারে—স্মরণে গোপত্ব, দ্বিজত্ব, সন্ন্যাসিত্ব বা বংশীমুখতা কাহাকেও চিনিবার পক্ষে নিশ্চিত লক্ষণ নহে বলিয়া এবং মুখ-গঠন সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা প্রশ্ন না থাকায়—অঙ্গের বর্ণই মুখ্য লক্ষণ বলিয়া গোপত্বাদি সম্বন্ধে কোনও উত্তর না দিয়া কেবল বর্ণসম্বন্ধেই গ্রন্থকার উত্তর দিয়াছেন । যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া—শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিজেকে শ্রীরাধা মনে করেন বলিয়াই—ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে “প্রাণনাথ” বলিয়া সম্বোধন করেন । ২৯৩-২৯৪ পয়ারের অন্তর্য্যঃ—তিনি শ্যাম, বংশীমুখ, এবং গোপ ( রূপে )-বিলাসী ; আর ইনি গৌর, কখনও দ্বিজ, কখনও সন্ন্যাসী । ( স্মরণে উভয়ে কিরূপে এক হইতে পারেন ? ) প্রভু ( কৃষ্ণ ) আপনি গোপী ( রাধা )-ভাব ধরিয়া ( গৌর হইয়াছেন, তাই উভয়ের একত্ব অসম্ভব নহে ) । অতএব ( শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া ) ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে “প্রাণনাথ” কহেন ।

অথবা, এই পয়ারদ্বয়ের অচরুপ অন্তর্য্য এবং অর্থও হইতে পারে ।

২৮৬ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণরূপের এবং শ্রীচৈতন্যরূপের বর্ণাদির বিশেষত্ব সংক্ষেপে জানাইতেছেন । অন্তর্য্যঃ—তঁহো ( শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ) শ্যাম, বংশীমুখ এবং গোপ ( রূপে )-বিলাসী ; আর, ইহঁো ( শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন ) গৌর, কখনও দ্বিজ, কখনও সন্ন্যাসী । ( কিরূপে গৌর হইলেন ? শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারণ করিয়া ) । অতএব—আপনে প্রভু ( কৃষ্ণ ) গোপী ( রাধা )-ভাব ধরিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে “প্রাণনাথ” করিয়া কহেন ।

এরূপ অন্তর্য্যে, ২৯৪-পয়ারে “অতএব”-এর পরে “আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি” বাক্য হইতেছে “অতএব”-এর ব্যাখ্যামূলক বাক্য—২৯৩ পয়ারে গৌরত্বের হেতু স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই বলিয়া ; অথচ, “অতএব” এর পরে “ব্রজেন্দ্র-নন্দনে কহে প্রাণনাথ করি” ইত্যাদি মুখ্যবাক্যে সেই হেতুর ইঙ্গিত আছে বলিয়া, “অতএব”-এর পরে গৌরত্বের হেতুমূলক এবং “অতএব”-এর ব্যাখ্যামূলক “আপনে প্রভু”-ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে ।

২৯৫ । সেই কৃষ্ণ—শ্রীরাধার মাদনাথ্য-প্রেমের বিষয় যিনি, সেই কৃষ্ণ । সেই গোপী—মাদনাথ্য-প্রেমের একমাত্র আশ্রয় যিনি, সেই গোপী শ্রীরাধা । ২৬৯ এবং ২৯৪ পয়ারে বলা হইয়াছে—বিষয়-শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়-শ্রীরাধার ভাবগ্রহণ করিয়াছেন ; ২৬৮ পয়ার হইতে বুঝা যায়, রাধাভাব-কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীরাধার কান্ত্যভাবের—মাদনাথ্যভাবের—বিষয় এবং আশ্রয় উভয়ই । কিন্তু একই ব্যক্তি—একই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—কিরূপে একই ভাবের বিষয় এবং আশ্রয় হইতে পারেন ? ইহাই পরম বিরোধ—একই পাত্র দুইটা বিরুদ্ধ ভাবের—বিষয়-জাতীয় ও আশ্রয়-জাতীয় ভাবের সমাবেশ বলিয়া ইহা অসম্ভব । অচিন্ত্য চরিত্র ইত্যাদি—প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছে ; একই পাত্র দুইটা বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ সাধারণতঃ অসম্ভব হইলেও মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহাতে তাহা সম্ভব হইয়াছে ।

ইথে তর্ক করি কেহো না কর সংশয়।

কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এইমত হয় ॥ ২৯৬

অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্যবিহার।

চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ ২৯৭

তর্কে ইহা নাহি মানে যেই ছুরাচার।

কুন্তীপাকে পচে, তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৯৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে,

স্থায়িভাবলহর্যাম্ ( ৫১ )—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ

প্রকৃতিভাঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যশ্চ লক্ষণম্ ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অচিন্ত্যাঃ অচিন্ত্যনীয়াঃ খলু নিশ্চিতং যে ভাবাঃ তর্কেণ তর্কশাস্ত্রেণ তান্ ভাবান্ ন যোজয়েৎ যোজনাং ন কুর্যাৎ ।  
যং প্রকৃতিভাঃ প্রকৃতিবিকারেভ্যঃ পরং ভিন্নং, তং অচিন্ত্যশ্চ লক্ষণং স্যাৎ । চক্রবর্তী ১০ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৯৬। ইথে—এ বিষয়ে; দুইটী বিরুদ্ধ-ভাবের একত্র সমাবেশ-বিষয়ে। এই পয়ার পূর্ববর্তী পয়ারের  
শেষাঙ্কেরই ব্যাখ্যামূলক।

২৯৭-২৯৮। কৃষ্ণচৈতন্যবিহার—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা অদ্ভুত এবং অচিন্ত্য—তর্কযুক্তির অতীত। চিত্র—  
বিচিত্র, অদ্ভুত, অচিন্ত্য। তর্কে—বহির্গুণ তর্কের বশীভূত হইয়া। ইহা নাহি মানে—ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি  
মানে না। কুন্তীপাক—একরকম নরকের নাম।

বস্তুতঃ, ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির অনুভব সাধন-সাপেক্ষ—মুখ্যতঃ ভগবৎ-কৃপাসাপেক্ষ—বস্তু; বহির্গুণ জীবের  
পক্ষে এই অনুভব সম্ভব নহে। অথচ, অচিন্ত্যশক্তিতেই ভগবানের অতীন্দ্রিয়ত্ব—তাহার বিশেষত্ব—তাহা না মানিলে  
ভগবানের বিশেষত্বই মানা হয় না; ভগবানের বিশেষত্ব—অতীন্দ্রিয়ত্ব—না মানিলেই অপরাধী হইতে হয়।

শ্লো। ১০। অন্বয়। যে (যে সমস্ত) ভাবাঃ (ভাব—পদার্থ) অচিন্ত্যাঃ (অচিন্ত্য) খলু তান্ (সে সমস্তকে—  
সে সমস্ত অচিন্ত্যভাব বা পদার্থকে) তর্কেণ (তর্কদ্বারা) ন যোজয়েৎ (যোজনা করিবে না)। যং চ (যাহা) প্রকৃতিভাঃ  
(প্রকৃতির—প্রকৃতির বিকারসমূহের) পরং (অতীত) তং (তাহা) অচিন্ত্যশ্চ (অচিন্ত্যের) লক্ষণম্ (লক্ষণ)।

অনুবাদ। যে সকল ভাব বা পদার্থ অচিন্ত্য, তর্ক দ্বারা সে সমস্তের যোজনা করিবে না (অর্থাৎ সে সমস্তকে  
তর্কের বিষয়ীভূত করিবে না); যাহা প্রকৃতির বিকার-সমূহের অতীত (অর্থাৎ যাহা অপ্রাকৃত), তাহাই অচিন্ত্য। ১০

আমরা প্রাকৃত জগতের লোক; প্রাকৃত বস্তু—প্রকৃতির বিকারভূত বস্তু—সহিতই আমাদের পরিচয়;  
আমাদের অভিজ্ঞতাও প্রাকৃত বস্তুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যুক্তিতর্কে আমরা এই প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতারই  
প্রয়োগ করিয়া থাকি; প্রাকৃত-বিষয়-সম্বন্ধীয় বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য।  
কিন্তু অপ্রাকৃত—চিন্ময় জগৎ-সম্বন্ধীয় কোনও বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার বিশেষ স্থান নাই। তাহার হেতুও  
আছে। যাহা প্রকৃতির বিকারভূত নহে—যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অপ্রাকৃত; এ সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তু স্বরূপে  
চিন্ময়; চিন্ময় বস্তু প্রাকৃত লোক-আমরা কখনও দেখি না, দেখিবার সম্ভাবনাও আমাদের নাই; কারণ, “অপ্রাকৃত বস্তু  
নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর।” শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্য ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই চিন্ময় জগতের কোনও সংবাদ  
আমরা পাইতে পারি না; সেই জগৎ আমাদের কোনও ইন্দ্রিয়েরই গোচরীভূত নহে বলিয়া আমাদের পক্ষে অচিন্ত্য।  
এই অচিন্ত্য চিন্ময় জগতের রীতিনীতি সর্ববিষয়ে আমাদের প্রাকৃত জগতের রীতিনীতির অনুরূপ না হইতেও পারে;  
কাজেই অচিন্ত্য চিন্ময় জগৎ-সম্বন্ধীয় কোনও বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করিলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে  
উপনীত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অবশ্য, শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্য হইতে চিন্ময় জগৎ-সম্বন্ধে যে  
তথ্য অবগত হওয়া যায়, প্রকৃতসিদ্ধান্ত-নির্ণয়ে সে সমস্ত তথ্যের প্রয়োগ—সে সমস্ত তথ্যমূলক তর্ক—অসম্ভব  
হইবে না। কিন্তু অনুরূপ তর্কের প্রয়োগ সমীচীন হইবে না।

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস ।  
 সেই জন যায় চৈতন্যের পদপাশ ॥ ২৯৯  
 প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার ।  
 ইহা যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥ ৩০০  
 লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ ।  
 তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ ॥ ৩০১  
 দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার ।  
 কথা কহি অনুবাদ করে বারবার ॥ ৩০২  
 তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদগণন ।  
 প্রথম-পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥ ৩০৩  
 দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ—

স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩০৪  
 তেঁহো ত চৈতন্যকৃষ্ণ শচীর নন্দন ।  
 তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য-কারণ ॥ ৩০৫  
 তহি-মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ ।  
 যুগধর্ম্মকৃষ্ণনাম প্রেম-প্রচারণ ॥ ৩০৬  
 চতুর্থ কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন ।  
 স্বমাদুর্য্য-প্রেমানন্দরস আস্বাদন ॥ ৩০৭  
 পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব নিরূপণ—  
 নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩০৮  
 ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার—  
 অদ্বৈত-আচার্য্য মহাবিশু-অবতার ॥ ৩০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২৯৯ । অদ্ভুত চৈতন্যলীলায়—শ্রীচৈতন্যের লীলার অদ্ভুতত্বে বা অচিন্ত্যত্বে ; শ্রীচৈতন্যের লীলা যে প্রাকৃত লোকের যুক্তিতর্কের বিষয়ীভূত নহে, তদ্বিষয়ে । পদপাশ—চরণের নিকটে । ভগবানে যাহার দৃঢ় অচল বিশ্বাস আছে, তিনিই ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিতে, তাঁহার লীলার অতীন্দ্রিয়ত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন । সুতরাং ভগবল্লীলার অদ্ভুতত্বে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহারই ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়া মনে করা যায় এবং ভগবানে এই দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ—সাধনের যে স্তরে উন্নীত হইলে ভগবানে এবং তাঁহার অদ্ভুত লীলায় এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, সেই স্তরে অবস্থান হেতু—ভগবচ্চরণ-সেবা লাভ তাঁহার পক্ষে সুলভ হইয়া পড়ে ।

৩০০ । এই সিদ্ধান্তের সার—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্ত সিদ্ধান্ত ।

৩০১ । অনুবাদ—কথিত-বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি । সমগ্র গ্রন্থে যাহা লিখিত হয়, গ্রন্থশেষে যদি সংক্ষেপে সে সমস্তের পুনরুল্লেখ করা যায়, তাহা হইলেই একসঙ্গে সমগ্র গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের আশ্বাদনের সুবিধা হয় । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের প্রত্যেক লীলার—আদি-লীলা, মধ্য-লীলা ও অন্ত্য-লীলার—বর্ণনার পরে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শেষ পরিচ্ছেদে সেই লীলার বর্ণিত বিষয়সমূহের সূত্রাকারে পুনরুল্লেখ করিয়াছেন ।

৩০২ । এইরূপ পুনরুল্লেখ-বিষয়ে পূর্ব্ব-মহাজনগণের আচরণ দেখাইতেছেন । স্বয়ং ব্যাসদেবও শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ-স্কন্ধের শেষে—দ্বাদশ-অধ্যায়ে সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ—গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ করিয়াছেন ।

৩০৩ । তাতে—অনুবাদ-বিষয়ে ব্যাসের আচরণ অনুকূল বলিয়া । আদি-লীলার ইত্যাদি—ইতঃপূর্বে এই গ্রন্থের আদিলীলার কোন্ পরিচ্ছেদে কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিতেছি । বস্তুতঃ প্রাচীন-দিগের অনুবাদ বর্ত্তমানযুগের সূচীপত্রের অনুরূপ ; পার্থক্য এই যে—প্রাচীনদের অনুবাদ থাকিত গ্রন্থের শেষভাগে, আর আধুনিক সূচীপত্র থাকে গ্রন্থারম্ভের পূর্বে ।

৩০৫ । কোনও কোনও গ্রন্থে “তেঁহো ত চৈতন্যকৃষ্ণ শচীর নন্দন ।”—এই পয়ারাঙ্ক নাই ; থাকা সম্ভব ।

৩০৬ । কোনও কোনও গ্রন্থে “তহি-মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ ।”—এই পয়ারাঙ্ক নাই ।

৩০৮ । রাম—বলরাম । “নিত্যানন্দ হৈলা রাম”—স্থলে “রাম নিত্যানন্দ হৈলা”—পাঠও দৃষ্ট হয় ।



সপ্তম-পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান ।  
 পঞ্চতত্ত্ব মিলে যৈছে কৈল প্রেমদান ॥ ৩১০  
 অষ্টমে চৈতন্যলীলাবর্ণন-কারণ ।  
 এক কৃষ্ণনামের মহা মহিমা-কথন ॥ ৩১১  
 নবমেতে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন ।  
 শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥ ৩১২  
 দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদিগণন ।  
 সর্বশাখাগণের যৈছে ফলবিতরণ ॥ ৩১৩  
 একাদশে নিত্যানন্দ শাখা-বিবরণ ।  
 দ্বাদশে অদ্বৈতস্কন্ধশাখার বর্ণন ॥ ৩১৪  
 ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্মবিবরণ ।  
 কৃষ্ণনাম-সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩১৫  
 চতুর্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ ।  
 পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা-সংক্ষেপ-কথন ॥ ৩১৬  
 ষোড়শ-পরিচ্ছেদে কৈশোর-লীলার উদ্দেশ ।

সপ্তদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ ॥ ৩১৭  
 এই সপ্তদশপ্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ ।  
 দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থমুখবন্ধ ॥ ৩১৮  
 পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত ।  
 সংক্ষেপে কহিল, অতি না কৈল বিস্তৃত ॥ ৩১৯  
 বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে ।  
 বিস্তারি বর্ণিল নিত্যানন্দ-আজ্ঞাবলে ॥ ৩২০  
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্বৈত অনন্ত ।  
 ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥ ৩২১  
 যে যেই-অংশ কহে শুনে—সেই ধন্য ।  
 অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৩২২  
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ ।  
 শ্রীবাস-গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ ॥ ৩২৩  
 যতযত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে ।  
 নম্র হৈয়া শিরে ধরৌ সভার চরণে ॥ ৩২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

৩১২ । আরোপণ—আ ( সম্যকরূপে ) রোপণ, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে স্পৃষ্ট কল ধরিতে পারে ।

৩১৮ । প্রবন্ধ—পূর্বাপর-সঙ্গতিযুক্ত রচনা ; কোনও বিষয়ে পূর্বাপর-সঙ্গতিযুক্ত আলোচনা বা বর্ণনা ।  
 এই সপ্তদশ ইত্যাদি—আদি-লীলার এই সতর পরিচ্ছেদে সতরটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে । প্রথম পয়ারাঙ্ক-স্থলে  
 —“এই সপ্তদশে লীলার প্রকার প্রবন্ধ”—এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় । লীলার প্রকার প্রবন্ধ—প্রভু কিরূপে লীলা  
 করিয়াছেন, তাহার আলোচনা । দ্বাদশ প্রবন্ধ—প্রথম বারটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত বারটি বিষয় । গ্রন্থ মুখবন্ধ—  
 গ্রন্থের মুখবন্ধ বা ভূমিকা-স্বরূপ । প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইল  
 সমগ্র গ্রন্থের ভূমিকার তুল্য ।

৩১৯ । পঞ্চপ্রবন্ধে—ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদ হইতে ষোড়শ-পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত পাঁচ পরিচ্ছেদেই গ্রন্থের মূল বর্ণনীয়  
 বিষয়—শ্রীচৈতন্যের লীলা—বর্ণিত হইয়াছে । পঞ্চরসের চরিত—শ্রীচৈতন্যচরিতের পাঁচটি রস ; ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে  
 জন্মলীলারস, চতুর্দশে বাল্য-লীলারস, পঞ্চদশে পৌগণ্ড-লীলারস, ষোড়শে কৈশোর-লীলারস এবং সপ্তদশে যৌবন-  
 লীলারস বর্ণিত হইয়াছে ।

৩২১ । শেষ—সহস্রবদন অনন্তদেব ।

৩২২ । যেই যেই অংশ ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্য-লীলার সম্পূর্ণ অংশ বর্ণন বা শ্রবণ করা কাহারও পক্ষেই  
 সম্ভব নয় ; কারণ, এই লীলা অনন্ত । সম্পূর্ণ না পারিলেও, যে ব্যক্তি এই লীলার কোনও এক অংশমাত্রও বর্ণনা  
 করিবেন বা শ্রবণ করিবেন, তিনিই ধন্য । কারণ, এই শ্রবণ-কীর্তনের প্রভাবে অবিলম্বেই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের  
 চরণসেবা পাইতে পারিবেন ।

শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ।

শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ ॥ ৩২৫

শিরে ধরি বন্দেঁ। নিত্য করোঁ তাঁর আশ ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-  
লীলাসুত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৩২৫। “শ্রীরঘুনাথ দাস” স্থলে “শ্রীরঘুনাথ দুই” এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। শ্রীরঘুনাথ দুই—দুইজন রঘুনাথ, রঘুনাথ-দাস ও রঘুনাথ-ভট্ট এই দুইজন ।

৩২৬। “শিরে ধরি” ইত্যাদি প্রথম পয়ারাঙ্কস্থলে “শ্রীল গোপালভট্ট-পদ করি আশ ।”—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার গৌররূপা-তরঙ্গিণী-টীকা সমাপ্তা ।

আদি-লীলা সমাপ্তা ।